PUNYATIRTHA-PROBHAS

A Bengali Travelogue on the Probhas and the Somnath

By

SONCU MOHARAJ

লেখকের কয়েকখানি সাম্প্রতিক গ্রন্থ ঃ

রাজভূমি-রাজস্থান

লীলাভূমি-লাহুল

গঙ্গা-যমুনার দেশে

ভাঙা দেউলের দেবতা

সোনা সুরা ও সাকী

গঙ্গাসাগর

উত্তরস্যাং দিশি

কেঁদুলীর মেলায়

তমসার তীরে তীরে

চতুরঙ্গীর অঙ্গনে

মধু-বৃন্দাবনে (ব্রজপর্ব, বনপর্ব ও মহাবনপর্ব)

ও

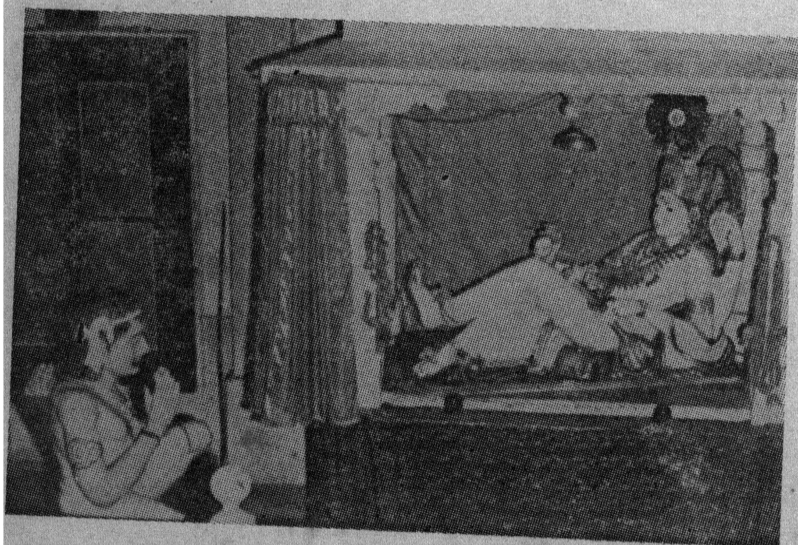
মন-দ্বারকায় !



শ্রীকৃষ্ণ, গীতামন্দির, দেহোৎসর্গ, প্রভাস



সামনে সোমনাথের নতুন মন্দির, ডাইনে দিগ্বিজয় দ্বার



শ্রীকৃষ্ণ ও জরা ব্যাধ। ভালকাতীর্থ

পুণ্যতীর্থ-প্রভাস

'নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥'

এবারে শুরু হল ফেরার পালা।

না। ঘরছাড়া সহযাত্রীরা ঘরের পথে পা বাড়ান নি। আমারও বৃন্দাবনে মানসীর কাছে ফিরে যাবার সময় হয় নি সমাগত। বৃন্দাবন বহুদূর।

তাহলেও গুজরাত ভ্রমণে এসে উত্তর-পশ্চিমে এগোবার পালা হয়েছে শেষ। পশ্চিমভারতের উত্তরপ্রান্তিক-বন্দর ওখা থেকে ট্রেন ছাড়ল এইমাত্র। 'মন-দ্বারকা' ও বেট-দ্বারকা দর্শনের পরে পুণ্যতীর্থ-প্রভাসের পথে যাত্রা হল শুরু। আমরা ফিরে চলেছি রাজকোট, পথে পড়বে দ্বারকা।

আবু-রোড থেকে দ্বারকা আসার সময়ে আমরা রাজকোট হয়েই এসেছি। এবারে সেই রাজকোট থেকেই ভেরাভলের ট্রেন ধরতে হবে। প্রভাস ও সোমনাথ বন্দরনগরী-ভেরাভলের উপকণ্ঠে অবস্থিত। তাই ভেরাভলগামী প্রধান ট্রেনটির নাম সোমনাথ-মেল।

হাওড়া থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে বারোদিন আগে। 'কুণ্ডু স্পেশাল' এই রেল-ভ্রমণের আয়োজন করেছেন। আমরা প্রথমে দিল্লী গিয়েছি। সেখান থেকে মথুরা। সহযাত্রীরা কৃষ্ণ-লীলাস্থল ও পর্যটকতীর্থ-আগ্রা দর্শন করেছেন। আর আমি সেই ছুটি দিন বাস করেছি বৃন্দাবনে—মানসীর বাসায়। তার পালিতা-কন্যা খুকুর বিয়ের পাকা কথাবার্তা বলেছি। মানসীর সঙ্গে রাধাগোবিন্দ মন্দিরে গিয়েছি। পরদিন আমার আপত্তি উপেক্ষা করে খুকুকে নিয়ে মানসী এসেছে আগ্রাফোর্ট স্টেশনে, ব্যবস্থাদি সরজমিনে তদন্ত করতে। সে ম্যানেজার ও সহযাত্রীদের আমার ক্ষীণস্বাস্থ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেছে। তাঁরা মুচকি হেসেছেন কিন্তু মানসী তা দেখতে পায় নি। ভালোবাসার আবেগে সে তখন দৃষ্টিহীনা।

অবশেষে আগ্রাফোর্ট স্টেশনে আমার জীবন-নাট্যের সেই অন্তিমদৃশ্যটি অভিনীত হয়েছে। খুকুর বিয়ের সময় বৃন্দাবন আসার প্রতিশ্রুতি পাবার পরে মানসী আঁচলে চোখ মুচেছে। সে প্রণাম করেছে আমাকে। তারপরে খুকুর একখানি হাত ধরে ধীর-পদক্ষেপে বেরিয়ে গিয়েছে স্টেশন থেকে। আমি অপলক নয়নে তাকিয়ে রয়েছি তার অপসৃয়মানা অনিন্দ্য-সুন্দর দেহটির দিকে। একটু বাদেই অগনিত মানুষের মাঝে মানসী গিয়েছে হারিয়ে।

ফিরে এসেছি গাড়িতে। তখন আমাদের গাড়ি বদল হয়েছে। কারণ আগ্রাফোর্ট থেকেই মিটারগেজ রেল। এখনও আমরা রয়েছি সেই ছোটগাড়িতে। হাওড়া থেকে যে ব্রডগেজ 'স্পেশাল ট্যুরিস্ট কোচ'-য়ে যাত্রা করেছিলাম, সেটি আগ্রাফোর্ট থেকে খালি চলে গিয়েছে আমেদাবাদ। প্রভাস-পরিক্রমা পূর্ণ করে আমেদাবাদ যাবো। সেখানে এই ছোট গাড়ি ছেড়ে আবার আগের সেই বড়গাড়িতে সওয়ার হব।

আমেদাবাদেই দেখা হবে ওদের সঙ্গে—শ্রী, পূর্ণিমা ও শঙ্করীর সঙ্গে। দেখা হবে কি? ওরা কি নির্দিষ্ট দিনটিতে পৌঁছতে পারবে সেখানে? ইতিমধ্যে কি শ্রী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে?

নিশ্চয়ই উঠবে। দ্বারকা ও বেট-দ্বারকায় রণছোড়জীর কাছে কি বৃথাই বার বার তার রোগমুক্তি কামনা করলাম? না, না। তিনি অবশ্যই আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন।*

তাহলে শ্রী অমন অসুস্থ হয়ে পড়ল কেন? কেন পূর্ণিমা ও শঙ্করী দ্বারকানাথকে দর্শন করতে পারল না? যেতে পারল না পুণ্যতীর্থ-প্রভাসে? তারা তো কোন অন্যায় করে নি। বরং অসুস্থা মেয়েকে নিয়েই পূর্ণিমা গিয়েছিল সতীতীর্থ-সাবিত্রী পাহাড়ে।**

* লেখকের 'মন-দ্বারকা'য় দ্রষ্টব্য।

** লেখকের 'রাজভূমি-রাজস্থান' দ্রষ্টব্য।

আজ সেকথাই বার বার মনে পড়ছে আমার। সেদিন আগ্রাফোর্ট স্টেশনে মানসী চলে যাবার পরে ফিরে এসেছি গাড়িতে। প্রথমেই এসেছি আমার সদ্যপরিচিতা সাতবছরের সাথী শ্রীর কাছে। দু-দিন দেখি নি তাকে। তাই তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে আমার সেই ফুটফুটে নতুন ভাগনীটির একখানি হাত ধরতে গিয়েছি। সে ছিটকে সরে গিয়েছে দূরে। ঠোঁট ফুলিয়ে বলে উঠেছে — তুমি ছোঁবে না আমাকে। আমি আর কথা বলব না তোমার সঙ্গে।

বুঝতে পেরেছি, দু-দিন মানসীর বাসায় ছিলাম বলে মেয়ের অভিমান হয়েছে। অনেক কষ্টে সেদিন আমি ওর মানভঞ্জন করেছি। অবশেষে বলেছি — এ-যাত্রায় আমি আর কখনও তোমাকে ছেড়ে যাব না মা?

শেষ পর্যন্ত সে প্রতিশ্রুতি আমি পালন করতে পারি নি। আর সে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্য আমিই দায়ী। আমারই জন্য পূর্ণিমা ও শঙ্করী আসতে পারল না দ্বারকায়, যেতে পারল না প্রভাসে।

আগ্রাফোর্ট থেকে আমরা এসেছি জয়পুর। সেখান থেকে আজমীর হয়ে পুষ্কর। আগের রাতেই শ্রীর একটু জ্বর হয়েছিল। পূর্ণিমা তাই মেয়েকে নিয়ে যেতে চাইছিল না সাবিত্রী পাহাড়ে। পুষ্কর থেকে দূরত্ব প্রায় মাইল তিনেক। বালিময় ও চড়াই হাঁটাপথ। তার ওপরে প্রখর রোদ। তবু তাকে বললাম — তুমি অযথা ভয় পাচ্ছ। ওর গা-টা একটু গরম হয়েছে মাত্র। ছাতা মাথায় দিয়ে কুলির কাঁধে চড়ে শ্রী নির্বিঘ্নে ঘুরে আসবে সাবিত্রী পাহাড় থেকে।

পূর্ণিমা তবু প্রতিবাদ করেছে। বলেছে — আমার ভয় করছে

ঘোষদা! মেয়ের কিছু হলে আমি বাড়িতে মুখ দেখাতে পারব না। ওর বাবা, ঠাকুরমা ও কাকাদের অমতে আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

পূর্ণিমা কলকাতার এক বনেদী ব্যবসায়ী পরিবারের শিক্ষিতা ও সুশ্রী, কুলবধূ। তার ব্যবসায়ী স্বামী আসতে পারে নি। পূর্ণিমা তার দিদি জামাইবাবু মা ও বোনের সঙ্গে তীর্থদর্শনে এসেছে।

সেদিন আমি কিন্তু পূর্ণিমার প্রতিবাদ উপেক্ষা করেছি। বলেছি —তোমার মেয়ের কিছুই হবে না। সে দিব্যি ঘুরে আসবে। তাছাড়া কুলির কোলে চড়ে ছাতা মাথায় দিয়ে গেলে কীই-বা হতে পারে? পুষ্করে এসে সাবিত্রী পাহাড়ে যাবে না? শুনেছি, ভারী সুন্দর জায়গা। মেয়েদের যেতেই হয় সেই সতীতীর্থে।

আর আপত্তি করে নি পূর্ণিমা। আমি ওদের নিয়ে গিয়েছি সাবিত্রী-পাহাড়ে। বিকেলে ফিরে এসেছি আজমীর। রাত সাড়ে আটটায় ট্রেন ছেড়েছে। শেষরাতে চিতোরগড় পৌছেছি।

সকালে দেখি শ্রীর গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু পর্যটকের যাত্রাপথ যে বড়ই নিষ্ঠুর। সেপথে কেউ কারও জন্য থেমে থাকতে পারে না। তাই শ্রী, পূর্ণিমা এবং তার মাকে গাড়িতে ফেলে রেখে নেহাৎ স্বার্থপরের মতো আমরা চিতোরদুর্গ দেখতে গিয়েছি।

সেদিন রাতে চিতোরগড় থেকে রওনা হয়ে পরদিন সকালে মাওলী জংশনে নেমে পড়লাম সবাই। না, সবাই নয়। শ্রীর জ্বর না কমায় পূর্ণিমা যেতে পারল না আমাদের সঙ্গে। সে রুগ্না মেয়েকে নিয়ে গাড়িতেই রয়ে গেল। সোজা চলে গেল উদয়পুর। আর আমরা বাসে করে নাথদ্বার, হলদিঘাট ও একলিঙ্গজী দর্শন করে দুপুরের পরে উদয়পুর পৌছলাম।

উদয়পুর থেকে এলাম আবু-রোডে। শ্রীর অবস্থা তখনও অপরিবর্তিত। ফলে পূর্ণিমা ও তার ছোট বোন শঙ্করী আমাদের সঙ্গে যেতে পারল না মাউন্ট-আবু। দেখতে পারল না দিলওয়ারা মন্দির। অথচ শঙ্করীও পূর্ণিমার মতোই বেড়াতে ভালবাসে। সবে

সে কলেজের পাট সাঙ্গ করেছে। অবিবাহিতা এই সুশ্রী তরুণীটির দিলওয়ারা দর্শনের বড়ই সাধ ছিল।

রাত ন'টা নাগাদ সেদিন আমরা মাউন্ট-আবু থেকে আবু-রোডে ফিরে এলাম। দুপুরবেলা গাড়িতে গরম লাগে ব. স মাউন্ট-আবু রওনা হবার আগে আমরা ওদের ফার্স্ট ক্লাশ ওয়েটিং রুমে রেখে গিয়েছিলাম। তখুনি আলাপ হয়েছিল আবু-রোড স্টেশনের দুজন বাঙালী যুবক টিকেট-চেকার বিমল সরকার ও সরোজ সরকারের সঙ্গে। তাঁরা স্বেচ্ছায় শ্রীকে ডাক্তার দেখাবার ও তার রক্ত পরীক্ষা করাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

ওয়েটিং রুমে এসে দেখি শ্রী একইভাবে নির্জীবের মতো পড়ে রয়েছে। পূর্ণিমাকে জিজ্ঞেস করলাম — ব্লাড রিপোর্ট দেখে ডাক্তারবাবু কি বললেন ?

— বললেন, ভয়ের কিছু নেই। তবে ওকে কয়েকদিন Complete bed-rest দিতে হবে। মানে ওকে নিয়ে এখন রেলে চড়া চলবে না।

— কিন্তু কাল সকালেই যে আমাদের গাড়ি ছাড়ছে এখান থেকে! আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছি।

পূর্ণিমা শান্তস্বরে জবাব দিয়েছে — আমি কাল আপনাদের সঙ্গে যাব না।

— যাবে না!

— না।

— কোথায় থাকবে ?

— বিমলদা বলেছেন, কাল সকালে রিটায়ারিং রুমের ব্যবস্থা করে দেবেন।

আমি বিমলবাবু ও সরোজবাবুর দিকে তাকিয়েছি। তাঁরা মাথা নেড়েছেন।

— কিন্তু তুই একটা অসুস্থা মেয়েকে নিয়ে এই অচেনা ও অজানা জায়গায় একা থাকবি কেমন করে ? পূর্ণিমার জামাইবাবু গোরাচাঁদ

সাহা প্রশ্ন করেছেন। গোরাচাঁদবাবু মধ্যবয়সী। ছোটখাটো শান্তশিষ্ট মানুষটি। কলকাতায় ভাল চাকরি করেন। ভদ্রলোক নিঃসন্তান। তাই ভাইঝি বিউটিকে মানুষ করছেন। কলেজ-ছাত্রী ষোড়শী বিউটিও সাহাবাবুর সঙ্গে এসেছে। সে মিসেস সাহা অর্থাৎ সেজদিকে 'মা' ডাকে কিন্তু সাহাবাবুকে বলে 'ছেলে'।

পূর্ণিমারাও সাহাবাবুর সঙ্গে এসেছে। সাহাবাবুর প্রশ্নের জবাব দিতে তার একটু দেরি হচ্ছে দেখেই বোধহয় শঙ্করী বলে ওঠে—আমিও ন'দির সঙ্গে এখানে থেকে যাব জামাইবাবু! আপনারা মাকে নিয়ে যান।

বিস্মিত সাহাবাবু চট করে কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু শঙ্করীর মা অর্থাৎ মাসিমার পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হয় না। তিনি বলেন—তার চেয়ে বরং তুই চলে যা ওদের সঙ্গে। আমি এখানে থাকছি।

—তা হয় না মা! কত আশা করে তুমি এ-যাত্রায় এসেছ। দ্বারকায় যাবে, রণছোড়জীকে দর্শন করবে। প্রভাসে তর্পণ সেরে, দর্শন করবে সোমনাথজীকে। তুমি জামাইবাবুদের সঙ্গে যাও, আমি ন'দির কাছে থাকছি। তুমি নিশ্চিন্তে তীর্থদর্শন কোরো মা! আমরা শ্রীকে সুস্থ করে তুলে ঠিক দিনটিতে আমেদাবাদে পৌঁছে যাব। একসঙ্গে ডাকোর গিয়ে রণছোড়জীর আদি-বিগ্রহ দর্শন করব।

শঙ্করী সবার ছোট। দিদিদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। অবিবাহিত ছোড়দা থাকেন কালিকাপুরে। বাগবাজারের বাড়িতে সেই এখন তার মায়ের অভিভাবিকা। সুতরাং মাসিমা আপত্তি করতে পারেন না।

কিন্তু আমি আপত্তি করি। বলি—মাসিমাকে নিয়ে তুমি গাড়িতে ফিরে যাও, আমি থাকব এখানে।

—তা হয় না ঘোষদা! ম্যানেজার পাঁচুবাবুর সঙ্গে প্রায় সবাই সমস্বরে বলে উঠেছে।

—কেন হবে না? আমি জিজ্ঞেস করেছি। বলেছি—আমারই জন্য শ্রী আজ এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

— এ আপনার ভুল ঘোষদা! শঙ্করী প্রতিবাদ করেছে। বলেছে — আপনিই তো বলেছেন, তীর্থের দেবতা না ডাক দিলে কেউ তীর্থে পৌঁছতে পারে না। আমরা নিশ্চয়ই কোন পাপ করেছি, তাই এবারে আমাদের দ্বারকা ও প্রভাস দর্শনের ছাড়পত্র মিলল না। অন্তর্যামী ও সর্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা নয় এবারে আমরা দ্বারকা ও প্রভাসে যাই। তবে তিনি নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে কৃপা করবেন। আমরা যেতে পারব দ্বারকা, দর্শন করতে পারব পুণ্যতীর্থ-প্রভাস।

— পাপ-পুণ্যের কথা থাক্ শঙ্করী! তুমি তো জানো, আমি শ্রীকে কথা দিয়েছি, এ-যাত্রায় আমি আর কখনো ওকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

কথাটা শেষ করেই আমি তাকিয়েছি শ্রীর দিকে। সে শুয়ে শুয়ে শুনছিল আমাদের কথা-বার্তা। আমার চোখে চোখ পড়তেই সে তার ছোট্ট একখানি হাতের ইসারায় কাছে ডেকেছে আমাকে। তাড়াতাড়ি আমি তার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। ক্ষীণকণ্ঠে সে ডেকেছে — মামু!

— কি বলছ মা! আমি তার মুখের সামনে ঝুঁকে পড়েছি।

সে বলেছে — মামু, তুমি দিদিমাকে নিয়ে দ্বারকা ও প্রভাসে যাও। দেখে এস রণছোড়জী ও সোমনাথজীকে। আমি তো তাঁদের কাছে যেতে পারছি না। তুমি না গেলে, কে ফিরে এসে আমাকে ঠঁদের গল্প বলবে? আমেদাবাদে আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে।

বিমলবাবু আশ্বাস দিয়েছেন — আপনারা নিশ্চিন্তে চলে যান দাদা! আমরা রয়েছি, ওনাদের কোন অসুবিধে হবে না। আমি কথা দিচ্ছি, মেয়েকে সুস্থ করে তুলে তার মা ও মাসির সঙ্গে নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ ষোল তারিখে ঠিক আমেদাবাদে পাঠিয়ে দেব।

সে-আশ্বাসে কেউ আশ্বস্ত হয়েছিল কিনা জানা নেই আমার, তবে আমি আশ্বস্ত হতে পারি নি। পূর্ণিমা ও শঙ্করী দু'জনেই যুবতী। তার ওপরে ওদের সঙ্গে বেশ কিছু টাকা-পয়সা থাকবে। দেখে ভাল লোক বলে মনে হলেও সদ্যপরিচিত বিমলবাবু ও সরোজবাবু সম্পর্কে

আমরা কিছু জানি না!

তাহলেও শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই হেফাজতে ওদের রেখে পরদিন সকালে আমাদের আবু-রোড ছাড়তে হয়েছে। তখন ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। কিন্তু শ্রীর ঘুম ভাঙে নি। পূর্ণিমা বসেছিল তার শিয়রে। তাই সে আমাদের ট্রেন ছাড়ার বাঁশি শুনেও বেরিয়ে আসতে পারে নি প্লাটফর্মে। শঙ্করী শুধু হাত নেড়ে বিদায় জানিয়েছে আমাদের। আমরাও চলন্ত ট্রেনে বসে হাত নেড়ে বিদায় নিয়েছি তার কাছ থেকে। তার সঙ্গে আমার ব্যবধান বেড়েছে। ক্রমে ক্রমে সে আবছা হয়ে এসেছে। একটু বাদেই আবু-রোড গেছে মিলিয়ে, শঙ্করী গিয়েছে হারিয়ে।

আর শ্রী! সাতবছরের সেই সরল শিশুটি জানতেই পারে নি যে তার মামু তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে স্বার্থপরের মতো পালিয়ে গেল রাজভূমি-রাজস্থান থেকে।

তারপরে পাঁচটি দিন কেটে গিয়েছে। আমাদের দ্বারকা ও বেট-দ্বারকা দর্শন শেষ হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র একবার ওদের খবর পেয়েছি। যেদিন ওদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল, সেদিন বিকেলেই মেহেসানা জংশন থেকে ফোনে খবর পাওয়া গিয়েছিল। বিমলবাবু বলেছিলেন — শ্রী ভালর দিকে। চার পাঁচদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

আর কোন খবর পাই নি ওদের। গত তিনটি দিন দেব-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ও উত্তেজনায় আমরা ওদের কথা প্রায় বিস্মৃত হয়েছিলাম। আজ সে আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত, উত্তেজনা প্রশমিত। আজ তাই ওখা থেকে গাড়ি ছাড়ার পরেই মনে পড়েছে ওদের কথা — শ্রী, পূর্ণিমা ও শঙ্করীর কথা।

"ঘোষদা!"

আমার ভাবনায় ছেদ পড়ে। তাড়াতাড়ি বাইরের দিক থেকে মুখ ঘোরাই। দেখি বৌদি দাঁড়িয়ে আছেন। বৌদি বলেন, "আপনার দাদা ডাকছেন আপনাকে।"

দাদা মানে আমার সহযাত্রী সরকারদা — মোহিতকুমার সরকার। ব্যবহারিক জীবনে একটি প্রেসের মালিক। কিন্তু সেটা শুধুই তাঁর ভরণ-পোষণের অবলম্বন মাত্র। তাঁর প্রকৃত পরিচয় তিনি একজন ভক্ত-বৈষ্ণব। কাঠিয়াবাবার শিষ্য। নিয়মিত তিলকসেবা করেন। বয়স চারের ঘরে। স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ, অমায়িক ও বন্ধুবৎসল। স্ত্রী শ্যামলী-বৌদিও স্বাস্থবতী, সুশ্রী এবং ধর্মপরায়ণা।

মৃদু হেসে বৌদিকে জিজ্ঞেস করি, "কেন? আবার কৃষ্ণকথার আসর বসছে নাকি?"

"হ্যাঁ। তাই তো আপনার ডাক পড়েছে।" তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াই। আবু-রোড থেকে যাত্রা করার পর থেকেই সরকারদা আমাদের কাছে মহাভারতের কৃষ্ণকথা বলছেন।

পাশের খোপে এসে দেখি সবাই আমার জন্য বসে রয়েছেন। আমি আসতেই সরকারদা শুরু করলেন, "সহযাত্রীগণ, আজ দুপুরে ওখায় বসে আমি আপনাদের কাছে কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ তথা শ্রীমদ্ভগবদগীতার কথা সংক্ষেপে বলেছি। তারপরে মহাভারতে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে উল্লেখযোগ্য ভাবে দেখতে পাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তৃতীয় দিনে……"

থামতে হল সরকারদাকে। ট্রেন থামল মিঠাপুরে। আর সেই সঙ্গে দ্বারকার পাণ্ডাজী উঠে এলেন গাড়িতে।

মিঠাপুর দ্বারকা এবং ওখার মধ্যবর্তী একটি বড় স্টেশন। দূরত্ব দ্বারকা থেকে উনিশ আর ওখা থেকে দশ কিলোমিটার। গতকালই পাণ্ডাজী বলেছিলেন — আজ তিনি এখানে দেখা করবেন আমাদের সঙ্গে। দ্বারকা ও বেট-দ্বারকার পাণ্ডাদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে। তাই পাণ্ডাজী ওখা যান নি। ওখা বেট-দ্বারকার পাণ্ডাদের করতলগত। তিনি সকালের ট্রেনে দ্বারকা থেকে এখানে এসে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন।

পাণ্ডাজীকে সানন্দ-স্বাগত জানাই। নির্বিঘ্নে আমাদের বেট-দ্বারকা দর্শন সুসম্পন্ন হয়েছে শুনে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন।

বলেন, "দ্বারকাধীশ কৃপা করেছেন আপনাদের। নইলে বেটের পাণ্ডাগুলো হচ্ছে এক একটি কষাই।"

বিউটি কথাটা খেয়াল করে। বলে, "আপনি বেট বলছেন কেন? বেট-দ্বারকা বলুন।"

"না," পাণ্ডাজী প্রতিবাদ করেন, "ওটা বেট তার মানে দ্বীপ, দ্বারকা নয়। দ্বারকা তো দর্শন করেছো কাল। দ্বারকা একটাই।"

"কিন্তু ওঁরা যে বললেন, ওঁদের দ্বারকাই আসল দ্বারকা?"

"বলল বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"মিথ্যেবাদী, চোর লম্পট। ওদের কথা বিশ্বাস কোরো না।"

বিউটি মাথা নাড়ে।

বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে বোধহয় বুঝতে পেরেছে, শত প্রতিবাদ করলেও পাণ্ডাজী তাঁর মত পালটাবেন না। নবদ্বীপ ও মায়াপুর, গোকুল ও গোকুল-মহাবনের মতোই দ্বারকা ও বেট-দ্বারকার পাণ্ডাদের এই বিরোধ মিটবে না কোনোকালে। পুরুষানুক্রমে এঁরা একে অপরের কুৎসা রটিয়ে যাবেন।

ট্রেন ছাড়ল মিঠাপুর থেকে। পাণ্ডাজী তাঁর থলি থেকে কার্ড বের করে আমাদের প্রত্যেককে একখানি করে দিলেন। বড় আকারের ভিজিটিং কার্ড। তাতে ইংরেজী, হিন্দী ও বাংলায় লেখা— 'তীর্থভ্রমণ সফল করিতে নির্ভরযোগ্য পাণ্ডা করুন। বাঙালীর একমাত্র পাণ্ডা, শ্রীমণিলাল জীবরাজ ভট্ট। নীলকণ্ঠ চক, দ্বারকা।'

কথায় কথায় পাণ্ডাজী বললেন, "আপনারা সকলেই পুণ্যাত্মা। সংসারে সামান্য সংখ্যক মানুষেরই দ্বারকা দর্শনের সৌভাগ্য হয়। আপনাদের মতো যে সব পুণ্যাত্মারা বাংলা থেকে দ্বারকায় আসেন, তাঁদের সেবা করাই আমার ধর্ম। বিনিময়ে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে আপনারা ভালবেসে যা দান করেন, তা দিয়েই আমাকে সংসার প্রতিপালন করতে হয়। আমার অন্য কোন আয় নেই। বাংলা ছাড়া অন্য কোন রাজ্যের যজমান নেই। তাই আমি আজ আবার

আপনাদের কাছে এসেছি। খুশি হয়ে আপনারা যে যা দেবেন, আমি তা-ই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করব।"

লোকটি সত্যই সেবাপরায়ণ। গতকাল দ্বারকায় সারাদিন ছায়ার মতো সঙ্গে রয়েছেন। সবার সব ফরমাশ হাসিমুখে পালন করেছেন। এঁকে সাহায্য করাই উচিত।

কিন্তু কত দেব? মশলা ব্যবসায়ী প্রৌঢ় সামন্তবাবু যথারীতি পঁচিশ টাকা দিয়েছেন। দুই ছেলে ও একজন কর্মচারীকে নিয়ে তিনি সস্ত্রীক তীর্থযাত্রায় এসেছেন।

আর বৃদ্ধ উকিলবাবু যথারীতি এক টাকা দিলেন। তিনি স্থুলাঙ্গী স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থদর্শনে এসেছেন। কিন্তু কোন মন্দিরে ঢোকেন নি।

সে যা-ই হোক্। এখন আমরা মাঝের মানুষগুলো পাণ্ডাজীকে কত করে দিই?

ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করে কোন ফল হল না। সে বলল, "যা পারেন, দিয়ে দিন।"

খুবই স্বাভাবিক। সে কোম্পানীর কর্মচারী। তার পরামর্শকে অনেকেই হয়তো নিরপেক্ষ বলে মেনে নিতে পারতেন না। কিন্তু আমরা যে মুশকিলে পড়ে গেলাম!

উমাদি মানে শ্রীমতী উমা মিত্র মুশকিল আসান করলেন। তিনি সভানেত্রীর মতো রুলিং দিলেন, "পাণ্ডাজী দরিদ্র ব্রাহ্মণ। সুতরাং যাঁরা এক পরিবারে দু-জন কিংবা তার বেশি, তাঁরা অন্তত জনপ্রতি দু-টাকা করে দিন। আর যাঁরা একজন রয়েছেন, তাঁরা দু-টাকা থেকে পাঁচটাকা পর্যন্ত যে যা পারেন, তা-ই দিন।"

বিনা প্রতিবাদে রুলিং মেনে নিই। একখানি পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিই পাণ্ডাজীর হাতে।

দুই

সাতটা নাগাদ ট্রেন দ্বারকা পৌঁছল। এখনও সন্ধে হতে কিছু দেরি রয়েছে। দ্বারকা শহর দেখা যাচ্ছে ছবির মতো। পাণ্ডাজীর সঙ্গে নেমে আসি প্লাটফর্মে। তাকিয়ে থাকি দ্বারকার দিকে।

স্টেশনটি শহরের শেষ প্রান্তে। গতকাল সকালে যখন এই প্লাটফর্মে আমাদের ট্রেন এসে থেমেছিল, তখন চারিদিক রণছোড়জীর জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

আর আজ? আমার সহযাত্রীরা সবাই শব্দহীন। আজ যে আর কারও দ্বারকা দর্শনের আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট নেই। তাই কেউ রণছোড়জীর জয়গান গাইছেন না। দ্বারকা আজ নেহাৎ পথের পাশে একটি অপ্রয়োজনীয় রেলস্টেশন। মিঠাপুর ও দ্বারকার মাঝে তফাৎ নেই কোন। তাহলে কি ভক্তিও প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী?

কি জানি, আমি কেমন করে এ প্রশ্নের উত্তর দেব? আমি যে ভক্তিহীন-অবৈষ্ণব। আমি শুধু একবার মন-দ্বারকার মাটিতে মাথা ঠেকাই, ঠিক গতকালের মতো। তারপরে তাকাই রণছোড়জী মন্দিরের দিকে।

জরাসন্ধের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ রণ ছেড়ে দিয়ে মথুরা থেকে এখানে পালিয়ে এসেছিলেন বলে, দ্বারকায় তিনি রণছোড়জী রূপে বিরাজমান।

মন্দিরের চূড়াটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। আমি আবার প্রণাম করি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ মন্দিরে সন্ধ্যারতি শুরু হবে। রণছোড়জীর জয়গানে মন্দির মুখরিত হবে। সমবেত ভক্তবৃন্দের মন-প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। করুণাময় কৃষ্ণের কৃপায় তাঁদের জীবন ধন্য হবে। মর্ত্যের মানুষ হয়েও তাঁরা সেই স্বর্গীয় পরিবেশে নরকের কথা বিস্মৃত হবেন।

ভক্তিহীন অ-বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও গতকাল এই সময়ে আমি ওখানে উপস্থিত হতে পেরেছিলাম। কিন্তু আজ দ্বারকা এসেও যেতে পারছি না দ্বারকাধীশের মন্দিরে। জানি না আর কোনদিন যেতে পারব কি না?

না পারলেই বা ক্ষতি কি? আমি তো দর্শন করেছি তাঁকে। বিশ্ব-ইতিহাসের সেই মহত্তম মহামানবের মনোহর মূর্তিকে। আমি যে তাঁর কাছে শ্রী, পূর্ণিমা ও শঙ্করীর জন্য মঙ্গলকামনা করেছি। মঙ্গল কামনা করেছি আমার মানসীর জন্য। তিনি নিশ্চয়ই আমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন।

জীবনে যদি আর কোনদিন দ্বারকা না-ও আসা হয়, তাহলেও যে সারাজীবন ধরে আমি দ্বারকার স্মৃতিচারণ করতে সমর্থ হব। চোখ বুজলেই দেখতে পাব আমার মনের-মানুষ রণছোড়জীকে। আর দ্বারকাদর্শনের প্রয়োজন নেই। দ্বারকা আমার মন-দ্বারকায় পরিণত হয়েছে।

পাণ্ডাজী ও ম্যানেজার বোধকরি কোন কাজের কথা আলোচনা করছে। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে আসি। নিজের জায়গায় এসে বসি।

কিছুক্ষণ বাদে গাড়ি ছাড়ে। পাণ্ডাজী প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানান। আমরা এগিয়ে চলি। আমি যে তীর্থযাত্রী। তীর্থের আকর্ষণে ঘর ছাড়লেও কোন তীর্থে চিরস্থায়ী হবার অধিকার নেই আমার। পথের ধূলি অঙ্গে না মাখলে তীর্থযাত্রার ফল পাওয়া যায় না। আমি তাই একতীর্থ থেকে আরেক তীর্থের পথে এগিয়ে চলেছি। এ চলার শেষ নেই।

কিন্তু নীরবতার শেষ আছে। গাড়ি দ্বারকা পৌঁছবার পর থেকে যে নীরবতা সমস্ত গাড়িখানাকে গ্রাস করেছিল, সরকারদা তার অবসান ঘটালেন। সহসা তিনি ঘোষণা করলেন, "চুপ-চাপ বসে না থেকে আসুন, আমরা কৃষ্ণকথা আলোচনা করি।"

সবাই সোচ্চার স্বরে বলে উঠলেন, "সাধু প্রস্তাব।"

সরকারদা শুরু করলেন, "সহযাত্রীগণ, আজ দুপুরে ওখায় বসে আমি আপনাদের কাছে কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ তথা সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভগবদগীতার কথা বলেছি। তারপরে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকে আমরা উল্লেখযোগ্য ভাবে দেখতে পাই যুদ্ধের তৃতীয় দিনে, কৃষ্ণ যখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে সুদর্শন চক্র হাতে ভীষ্মকে হত্যা করতে ছুটে গিয়েছিলেন। একদিকে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র তখন ভীষ্মের পরাক্রমের কাছে অবনত, অন্যদিকে অর্জুনের মৃদু যুদ্ধ এবং পাণ্ডব-সৈন্যদের পলায়ন কৃষ্ণকে সেদিন ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। তাই সাত্যকি যখন পলায়মান পাণ্ডবসৈন্যদের ফিরিয়ে আনবার জন্য বৃথা চেষ্টা করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন — যারা চলে যেতে চাইছে, তাদের যেতে দাও। আজ আমিই ভীষ্ম ও দ্রোণসহ সমস্ত কৌরব পক্ষীয়দের বধ করে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসাব।

"তিনি সুদর্শন হাতে নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন। মত্তহস্তীর মতো ভীষ্মের দিকে ছুটে গেলেন। কৌরবরা আর্তনাদ করে উঠলেন। ভীষ্ম কিন্তু আত্মরক্ষার কোন চেষ্টাই করলেন না। তিনি হাতের ধনুক ফেলে দিয়ে শান্তস্বরে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন — দেবেশ জগন্নিবাস চক্রপানি মাধব! এসো এসো, তোমাকে নমস্কার করি। সর্বশরণ্য, লোকনাথ, আমাকে রথ থেকে ফেলে দাও। তোমার হাতে মারা গেলে যে আমার ইহকাল ও পরকাল ধন্য হবে।

"অর্জুন তাড়াতাড়ি ছুটে এসে শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরলেন। সবিনয়ে বললেন—কেশব, তুমিই আমাদের গতি, তুমি ক্রোধ সংবরণ কর। আমি শপথ করছি, প্রতিজ্ঞা পালন করব। তোমার নির্দেশ মতো কৌরবদের বধ করব।" থামলেন সরকারদা।

আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকাই। তিনি আবার বলতে থাকেন, "আপনারা জানেন, তারপরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ আর অস্ত্রধারণ করেন নি, কিন্তু ভীষ্মের পতন থেকে শুরু করে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ পর্যন্ত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি পাণ্ডবদের পরামর্শ দিয়েছেন। পাণ্ডবরা শুধু তাঁর পরামর্শ মতো কাজ করে গিয়েছেন। [illegible] তারই

ফলে বিজয়লক্ষ্মী কুরুক্ষেত্রে এসে পাণ্ডবদের গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছেন। অস্ত্রধারণ না করেও কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি। তাঁর সাহায্য ছাড়া অর্জুন কিছুতেই ভগদত্ত, জয়দ্রথ, দ্রোণাচার্য ও কর্ণ প্রভৃতিকে বধ করতে পারতেন না। শুধু তাই নয়, যুদ্ধ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ পাণ্ডবদের অশেষ উপকার সাধন করেছে।"

"যেমন ?" সরকার থামতেই কল্পনাদি প্রশ্ন করেন। কল্পনাদি মানে শ্রীমতী কল্পনা রায়, মধ্যবয়সী ভক্তিমতী। দেখতে সুশ্রী, স্বভাবটি শান্ত। প্রতিদিন সকালে গীতাপাঠ না করে জলগ্রহণ করেন না। তিনি একাই যাত্রায় এসেছেন, তবে আমার সহযাত্রিণী ঠাকুরমারা তাঁর পরিচিতা।

সরকারদা কল্পনাদির প্রশ্নের উত্তর দিতে পারার আগেই ছোট-ঠাকুরমা বলে বসলেন, "আইজ আপনার কি হইছে কয়েন তো দাদা ?"

"কেন ?" সরকারদা তাঁর অভিযোগের কারণ খুঁজে পান না।

"আইজ আপনে ক্যাবলই সংক্ষেপ করতে আছেন।"

আমরা ঠাকুরমার কথা শুনে হেসে উঠি। পাশের খোপ থেকে দাদা হেঁকে উঠলেন, "কি হল ? কৃষ্ণকথার মধ্যে এত হাসাহাসি কেন ?"

দাদা মানে সত্তর বছরের প্রবীণযুবা শ্রীভূপেশচন্দ্র দত্ত। বরিশালের মানুষ। এখন বাঘাযতীন কলোনীর বাসিন্দা। বছর দু'য়েক আগে স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। তারপরেই তীর্থদর্শনের নেশা পেয়ে বসেছে তাঁকে। হাওড়ায় গাড়ি ছাড়ার পর থেকেই তিনি আমার দাদা হয়ে গিয়েছেন।

আমরা লজ্জা পেলাম।

লজ্জা পেলেন সরকারদাও। তিনি ঠাকুরমাকে বললেন, "সংক্ষেপ করছি কারণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা ভারতের আপামর মানুষের নখদর্পণে। আপনারা সবাই জানেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল আঠারো-

দিন ধরে। যুদ্ধের দশম দিনে ভীষ্ম শরশয্যা গ্রহণ করেন। ত্রয়োদশ দিনে অর্জুন যখন নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন সপ্তরথী অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুকে হত্যা করেন। চতুর্দশ দিনে ভীম কৌরবদের একশ' ভাইয়ের আটানব্বই জনকে বধ করেন। পঞ্চদশ দিনে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে হত্যা করেন। ঐ দিনই দ্রুপদরাজও নিহত হন। ষোড়শ দিনে ভীম দুঃশাসনের বুকের রক্তপান করেন। সপ্তদশ দিনে অর্জুন কর্ণকে বধ করেন। অষ্টাদশ দিনে শল্য নিহত হন এবং ভীম দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেন। সেদিন রাতেই অশ্বত্থামা দ্রোপদীর পাঁচ ছেলেকে হত্যা করেন। অর্জুন পুত্রহন্তা অশ্বত্থামার মাথার মণি ছিনিয়ে নেন। ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে উত্তরার গর্ভস্থ সন্তানকে বধ করেন।

"এই সব কাহিনী এবং তাঁর প্রত্যেকটিতে কৃষ্ণের প্রভাবের কথা আপনাদের সবারই জানা রয়েছে। তা সত্ত্বেও আপনারা যখন শুনতে চাইছেন, তখন সংক্ষেপে কয়েকটি ঘটনা বলছি।"

"কয়েন," ঠাকুরমার কণ্ঠস্বরে খুশির আমেজ।

সরকারদা শুরু করেন, "এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমি বলব ভীষ্ম-পর্বের ১০৮ অধ্যায়ের কথা। এই অধ্যায়ে মহাভারতকার বলেছেন, যুদ্ধে ভীষ্মের পরাক্রম দেখে যুধিষ্ঠির-কৃষ্ণকে বললেন — ভীষ্ম প্রতিদিনই আমাদের অসংখ্য সৈন্য নিহত করছেন, অতএব যুদ্ধে আমার আর স্পৃহা নেই, আমার পক্ষে এখন বনবাসী হওয়াই ভাল। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন — অগ্নিসম ও ইন্দ্রসদৃশ ভাইরা থাকতে আপনি বিষাদগ্রস্ত হবেন না। তাছাড়া আমিও তো রয়েছি। আপনার আদেশ পেলে আমি আজই ভীষ্মকে বধ করতে পারি। আপনাদের শত্রু আমার শত্রু, আপনাদের প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন। ধনঞ্জয় আমার সখা সম্বন্ধী ও শিষ্য। আমি তার জন্য আমার শরীরের যে কোন জায়গা থেকে যেমন মাংস কেটে দিতে পারি, তেমনি সেও আমার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে। পার্থ উপপ্লব্যনগরে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে গাঙ্গেয়কে বধ করবে। তাই

আমি তাঁকে বধ করতে পারছি না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ভীষ্ম ইতিমধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়েছেন, কয়েকদিনের মধ্যেই অর্জুন তাঁকে বধ করতে সমর্থ হবে। নিরুৎসাহ হবেন না। তার চেয়ে বরং চলুন, একবার কৌরব শিবির থেকে ঘুরে আসা যাক্।

—কৌরব শিবির! পঞ্চপাণ্ডব সবিস্ময়ে বলে উঠলেন।

"—হ্যাঁ। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে উত্তর দিলেন—ইচ্ছামৃত্যু বরণ না করলে যে দেবব্রতের মৃত্যু হবে না। কাজেই চলুন, তাঁর কাছ থেকেই জেনে আসা যাক্, কিভাবে তাঁকে বধ করতে হবে। আপনি জিজ্ঞেস করলে, তিনি নিশ্চয়ই উপায়টি বলে দেবেন।

"আপনারা জানেন এই পরামর্শ মতো কাজ করেই অর্জুন ভীষ্মদেবকে বধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।"

আমরা ঘাড় নাড়ি। সরকারদা বলতে থাকেন, "তারপরে কুরুক্ষেত্রে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে উল্লেখযোগ্যভাবে সক্রিয় দেখতে পাই দ্রোণপর্বের ২৯ অধ্যায়ে। যুদ্ধের দ্বাদশ দিবসে অর্জুন সুশর্মার ভাইদের নিহত করলেন। তখন প্রাগজ্যোতিষেশ্বর মহাবীর ভগদত্ত হাতির পিঠে চড়ে ছুটে এলেন অর্জুনের সামনে। তিনি তাঁকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু সুবিধা করতে পারলেন না। অর্জুনের শরাঘাতে ভগদত্তের হাতির বর্ম ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে গেল। ক্রুদ্ধ ভগদত্ত তখন মন্ত্রপাঠের পরে অর্জুনের বুক লক্ষ্য করে বৈষ্ণব অংকুশ-অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন।

"শ্রীকৃষ্ণ প্রমাদ গণলেন। তিনি জানতেন, ভগদত্তের সেই চরম আঘাত সহ্য করার সাধ্য নেই ধনঞ্জয়ের। তাড়াতাড়ি তিনি এগিয়ে এসে অর্জুনকে আড়াল করে দাঁড়ালেন, নিজের বুকে বৈষ্ণবাস্ত্র গ্রহণ করলেন। বিষ্ণুর বুকে বেঁধে বৈষ্ণবাস্ত্র বৈজয়ন্তী মালায় রূপান্তরিত হল। পার্থসারথি পার্থের জীবনরক্ষা করলেন।"

সরকারদা থামতেই বিউটি বলে ওঠে, "তারপরে?"

"তারপরে চা।" ম্যানেজারের গলা শুনে বিস্মিত হই। তাকিয়ে দেখি চায়ের কেটলি হাতে স্বয়ং ম্যানেজার পাঁচুগোপাল দে।

স্বাস্থ্যবান কর্মঠ ও বুদ্ধিমান যুবক।

কাপটা হাতে নিয়ে বলি, "এখন আবার চা?"

"হ্যাঁ। এ্যাডিশন্যাল টি, স্পেশালী মেড্।"

"ধন্যবাদ।"

চা পরিবেশনের পরে বিউটির দিকে তাকিয়ে সরকারদা আবার বলতে শুরু করেন, "তারপরে কৃষ্ণের কথা বলতে হলে উল্লেখ করতে হবে দ্রোণপর্বের ১৪২ অধ্যায়। যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণের যে শুধু পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি নজর ছিল, তাই নয়। মিত্রপক্ষের সবার প্রতি সমান দৃষ্টি ছিল তাঁর। ভূরিশ্রবার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সাত্যকি সেদিন যখন প্রায় অস্ত্রশূন্য হয়ে পড়েছেন, ঠিক তখনিই শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে বললেন —সাত্যকিকে সাহায্য কর। তিনি সাত্যকির দিকে রথ ছোটালেন। ততক্ষণে ভূরিশ্রবা তরবারি হাতে নিয়ে অস্ত্রহীন সাত্যকির মস্তক ছেদন করতে উদ্যত হয়েছেন। অর্জুন দূর থেকেই 'নিশিত ক্ষুরপ্র' শর দিয়ে ভূরিশ্রবার সেই হাতখানি কেটে ফেললেন। সাত্যকির শুধু জীবনরক্ষা পেল না, তিনি অনায়াসে ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবাকে বধ করতে পারলেন।

"তারপরে আপনারা সবাই জানেন যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিবসে অভিমন্যুকে অন্যায়যুদ্ধে বধ করার পরে অর্জুন প্রতিজ্ঞা করলেন— পাপী জয়দ্রথ জীবিত থাকতে যদি কাল সূর্যাস্ত হয়, তাহলে আমি জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করব। তখন শ্রীকৃষ্ণই যোগমায়া বিস্তার করে অর্জুনের প্রতিজ্ঞারক্ষা সম্ভব করে তুলেছিলেন। শুধু তাই নয়, কিভাবে জয়দ্রথের শিরচ্ছেদ করতে হবে, তা পর্যন্ত তিনি অর্জুনকে বলে দিয়েছিলেন।"

আমরা মাথা নাড়ি। সরকারদা চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বলতে থাকেন, "আবার সাত্যকিকে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখে অর্জুন যখন কর্ণকে আক্রমণ করতে চাইলেন, তখন কেশব সব্যসাচীকে বললেন—এখুনি তোমার কর্ণের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, কারণ তার কাছে প্রজ্বলিত মহোল্কাসদৃশ বাসবপ্রদত্ত শক্তি

বিদ্যমান। আমি জানি কখন তোমাকে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।

"তেমনি দ্রোণপর্বের ১৪৮ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত দেখে তিনি তাঁকে বললেন — আপনি দ্রোণাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করুন। কারণ দ্রোণ আপনাকে বন্দী করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন। দ্রোণকে বধ করবার জন্য যে জন্মগ্রহণ করেছে, সে যথা-সময়ে তার কর্তব্য সম্পাদন করবে। তাছাড়া আপনি রাজা। রাজা কেবল রাজার সঙ্গেই যুদ্ধ করেন। আপনি হাতি ঘোড়া ও রথে পরিবৃত হয়ে দুর্যোধনের কাছে যান। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করুন।

"যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে দ্রোণাচার্য অনবরত পাণ্ডবসৈন্য নিহত করছেন দেখে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন — এখন ধর্মের কথা ভুলে জয়ের কথা ভাবো। দ্রোণকে না মারতে পারলে, তিনি একাই তোমাদের সবাইকে মেরে ফেলবেন। আমার ধারণা কেউ তাঁকে পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ দিলে, তিনি অস্ত্র ত্যাগ করবেন। অস্ত্রত্যাগ করলে যে কেউ ওঁকে বধ করতে পারবে।

"প্রস্তাবটা অর্জুনের পছন্দ হল না। পছন্দ হল না যুধিষ্ঠিরেরও। তবু বৃহত্তর প্রয়োজনে তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিতে সম্মত হলেন। মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার অশ্বত্থামা নামে একটি হাতি ছিল। ভীম তাকে গদাঘাতে নিহত করলেন। তারপরে যুধিষ্ঠির দ্রোণের কাছে গিয়ে প্রথমে উচ্চস্বরে বললেন — 'অশ্বত্থামা হতঃ'। পরে অনুচ্চকণ্ঠে যোগ করলেন — 'ইতি কুঞ্জরঃ (গজ)'।

"পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে শোকে অভিভূত হয়ে দ্রোণ শরাসন ত্যাগ করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন অনায়াসে দ্রোণাচার্যকে বধ করতে পারলেন। দ্রোণাচার্যকে বধ করবার জন্যই দ্রুপদ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড থেকে ধৃষ্টদ্যুম্নকে লাভ করেছিলেন।"

"হইয়া গেল ?" সরকারদা থামতেই ঠাকুরমা বলে ওঠেন, "এইয়ার মধ্যেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়া গেল ?"

সহাস্যে সরকারদা বলেন, "না ঠাকুরমা ! সবে দ্রোণপর্ব শেষ

হল। এখনও কর্ণপর্ব, শল্যপর্ব, সৌপ্তিকপর্ব ও স্ত্রীপর্ব রয়েছে। তারপরে শান্তিপর্ব।"

"আছে তো চুপ কইরা আছেন ক্যান ? কয়েন।"

সরকারদাকে শুরু করতে হয়, "আগেই বলেছি, অস্ত্রধারণ না করেও কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি। যুদ্ধের আঠারো দিন সর্বদা সর্বদিকে সজাগ দৃষ্টি ছিল তাঁর। তাই কর্ণপর্বের ৬১ অধ্যায়ে অর্থাৎ যুদ্ধের সপ্তদশ দিবসে যুধিষ্ঠিরকে কর্ণের সঙ্গে সংগ্রামে পরাজিত হতে দেখে তিনি অর্জুনকে বললেন — রাজা যুধিষ্ঠিরকে কর্ণ ক্ষতবিক্ষত করেছেন। তুমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আশ্বস্ত কর। তারপরে ফিরে এসে কর্ণকে বধ করবে।

"আহত যুধিষ্ঠির কৃষ্ণার্জুনকে দেখে প্রথমে খুশি হলেন। ভাবলেন অর্জুন নিশ্চয়ই কর্ণকে বধ করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কিন্তু তারপরে যখন জানতে পারলেন কর্ণ নিহত হন নি তখন তিনি অর্জুনকে তিরস্কার করলেন। বললেন — দুরাত্মা, তুই যদি কেশবকে ধনু দিয়ে নিজে সারথি হতি, তাহলে কেশব এতদিনে কর্ণকে বধ করত। তুই যদি পঞ্চম মাসে গর্ভচ্যুত হতি কিংবা কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ না করতি, তাহলেই ভাল হত। তোর গাণ্ডীবকে ধিক, তোর বাণসমূহকে ধিক, তোর কপিধ্বজ রথকে ধিক। তুই যদি রাধেয়কে আক্রমণ করতে ভয় পাস, তাহলে আর কাউকে গাণ্ডীব দিয়ে দে না!

"যুধিষ্ঠিরের কথায় অর্জুন ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। তিনি খড়্গ হাতে নিলেন। বললেন — আমার প্রতিজ্ঞা আছে, যে আমাকে গাণ্ডীব দিয়ে দিতে বলবে, আমি তার শিরচ্ছেদ করব।"

" — ধিক, অর্জুন ধিক। কৃষ্ণ ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠলেন — তুমি ধর্মভীরু কিন্তু মূর্খ। যুধিষ্ঠিরের মতো ধর্মজ্ঞ জ্যেষ্ঠকে তুমি বধ করতে চাও! তুমি অবুঝ বালকের মতো প্রতিজ্ঞা করেছো আর এখন মূঢ়ের মতো তা পালন করতে চাইছো। সত্য বলাই ধর্মসঙ্গত, সত্যের চেয়ে বড় কিছু নেই। কিন্তু সত্যানুসারে কর্মের অনুষ্ঠান উচিত কিনা,

তা স্থির করা অত্যন্ত কঠিন। যেখানে মিথ্যা সত্যের মতো হিতকর, সেখানে মিথ্যা বলাই উচিত। তাছাড়া—

'বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে।
বিপ্রস্য চার্থে হ্যনৃতং বদেত
পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি॥'

অর্থাৎ বিবাহকালে রতিসম্বন্ধে প্রাণসংশয়ে সর্বস্বনাশের সম্ভাবনায় ও ব্রাহ্মণের উপকারার্থে মিথ্যা বলা যেতে পারে। এই পাঁচ অবস্থায় মিথ্যা বললে পাপ হয় না।

"অনুতপ্ত অর্জুন বললেন—কৃষ্ণ, তুমি আমাদের মাতা-পিতার মতো, তুমিই আমাদের পরম-গতি। আমি বুঝেছি যে ধর্মরাজ আমার অবধ্য। কাজেই এমন বুদ্ধি দাও, যাতে আমার সত্যরক্ষা হয় অথচ আমরা দুজনেই বেঁচে থাকতে পারি।

"কৃষ্ণ বললেন—কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যুধিষ্ঠির ক্ষোভ এবং ক্রোধের বশে তোমাকে অনুচিত বাক্য বলেছেন। তিনি অবধ্য অথচ তোমার প্রতিজ্ঞাও পালনীয়। তিনি যাতে জীবিত থেকেও মৃত হতে পারেন, সেই উপায় অবলম্বন কর।

"অর্জুন বুঝতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—কি উপায়ে।

"—যুধিষ্ঠির মাননীয়। মানীলোক যতকাল সম্মান পান, ততকালই জীবিত থাকেন। অপমানিত হলেই তাঁরা জীবন্মৃত হন। তুমিও যুধিষ্ঠিরকে একবার 'তুমি' বলে অপমান কর, তিনি জীবন্মৃত হোন। তারপরে তুমি তাঁর চরণবন্দনা কর। এইভাবে সত্যভঙ্গ ও ভ্রাতৃবধের পাপমুক্ত হয়ে তুমি হৃষ্টচিত্তে সুতপুত্রকে বধ কর।"

থামলেন সরকারদা। কিন্তু আমরা কেউ কিছু বলতে পারার আগেই তিনি আমাদের কাছে প্রশ্ন রাখলেন, "তারপরে অর্জুন কি করে কর্ণকে বধ করলেন, তা আপনারা জানেন। এবং এও জানেন যে কৃষ্ণের সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব হত না। আর কর্ণ বধই প্রকৃতপক্ষে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলাফল নির্দ্ধারণ করে দিয়েছে।"

"কেন ?" উমাদি বোধ হয় মন্তব্যটি মেনে নিতে পারছেন না। তিনি বললেন, "তাঁর পরেও তো শল্য ছিলেন। ছিলেন কর্ণের ছেলে চিত্রসেন, সত্যসেন ও সুষেণ। ছিলেন অশ্বত্থামা কৃতবর্মা ও শকুনি। ছিলেন দুর্যোধন এবং তাঁর পুত্রগণ।"

"ছিলেন। কিন্তু পাণ্ডবরা একদিনেই তাঁদের প্রায় সবাইকে সাবার করেছিলেন। সূর্যপুত্র কর্ণের দেহরক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই কৌরব-পক্ষের সৌভাগ্য-সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। এবং তা সম্ভব হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের জন্যই। কিন্তু তারপরেও কৃষ্ণের কাজ শেষ হয় নি। তাঁর নির্দেশে ভীম যুধিষ্ঠিরের উরুভঙ্গ করার পরেই নিরপেক্ষ বলরাম ছুটে এসেছিলেন কুরুক্ষেত্রে। বার বার ভীমকে ধিক্কার দিয়ে তিনি বললেন — ধর্মযুদ্ধে নাভির নিচে গদাঘাত করা শাস্ত্রসঙ্গত নয়। তিনি লাঙ্গল উঁচু করে ভীমকে আক্রমণ করতে গেলেন।

"কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি দু'হাতে দাদাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন — শাস্ত্রে ছয় প্রকার উন্নতি ও অবনতির কথা আছে। মিত্রদের, বন্ধুদের ও নিজের উন্নতি এবং শত্রু, তার মিত্র ও বন্ধুদের অবনতি। পাণ্ডবরা আপনার পিসতুতো ভাই। তারা আপনার মিত্র। তাদের অবনতি আপনার কাম্য হওয়া উচিত নয়। তাছাড়া আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে প্রতিজ্ঞাপালন প্রত্যেক ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম। আপনি তো জানেন, শকুনির কপট-দ্যূতক্রীড়ার পরে প্রকাশ্য রাজসভায় দুঃশাসন একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করতে চেয়েছিল, দুর্যোধন কাপড় তুলে দ্রৌপদীকে নিজের বাম উরু দেখিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি সতীসাধ্বী দ্রৌপদীকে তাঁর অনাবৃত কোলে এসে বসতে বলেছিলেন। মহাবীর বৃকোদর তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে দুঃশাসনের বুকের রক্তপান করবেন এবং গদাঘাতে দুর্যোধনের উরু-ভঙ্গ করবেন। ভীমসেন সেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য বাধ্য হয়ে এই অশাস্ত্রীয় কাজ করেছেন।

"ধর্মপরায়ণ হলধর বাধ্য হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করলেন। ভীম বলরামের ক্রোধানল থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। তারপরেও কৃষ্ণ

আরেকবার ভীমকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন।”

“কখন?” সরকারদা থামতেই বিউটি প্রশ্ন করে।

সরকারদা তাঁর ষোড়শী-শ্রোতার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, “যুদ্ধজয়ের পরে পঞ্চপাণ্ডব ও কৃষ্ণ যখন ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করতে এসেছিলেন।”

“কি হয়েছিল তখন?”

“যুধিষ্ঠির প্রণাম করার পরে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন। তারপরেই তিনি ভীমকে খুঁজতে থাকলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্ধরাজার দুরভিসন্ধি বুঝতে পারলেন। তিনি ভীমকে সরিয়ে দিয়ে দুর্যোধনের তৈরি করে রাখা ভীমের লৌহমূর্তিটি ধৃতরাষ্ট্রের সামনে এগিয়ে দিলেন। অযুত হাতির মতো বলবান ধৃতরাষ্ট্র বুকে চেপে সেই লৌহমূর্তি চূর্ণ করে ফেললেন। কিন্তু তারপরেই পুত্রশোকাতুর পিতার জ্ঞান ফিরে এলো। তিনি ‘হা ভীম, হা ভীম’ বলে কাঁদতে শুরু করলেন।

“কৃষ্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন — মহারাজ, আপনি ভীমকে বধ করেন নি। তার লৌহমূর্তি চূর্ণ করেছেন। আপনি শান্ত হোন, ধর্মপথে চলুন। ভীমসেনকে মেরে ফেললেও আপনার পুত্ররা বেঁচে উঠবে না।

“ধৃতরাষ্ট্র বললেন — মাধব, তুমি সত্য কথাই বলেছো। আমার ছেলেরা মারা গিয়েছে, এখন পাণ্ডুর ছেলেরাই আমার ছেলে। তিনি সস্নেহে ভীমসেনকে বুকে টেনে নিলেন।

“ধৃতরাষ্ট্রের রোষ প্রশমিত হলেও গান্ধারীর ক্রোধ কমল না। আর তার সব রাগ গিয়ে পড়ল কৃষ্ণের ওপর। যদিও তিনি জানতেন যে শ্রীকৃষ্ণ স্বার্থশূন্য হয়েই পাণ্ডবদের সাহায্য করেছিলেন, ধর্মরক্ষার জন্যই কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাহলেও তিনি কৃষ্ণকে অভিশাপ দিলেন।

“গান্ধারী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। প্রতিদিন সকালে যুদ্ধযাত্রার আগে দুর্যোধন যখন এসে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন, তখন তিনি তাঁকে বলতেন — যে পক্ষে ধর্ম, সেই পক্ষেরই জয় হবে।

"তাই পাণ্ডবরা ভয়ে ভয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কারণ সেই ধর্মপরায়ণা সতী যদি তাঁদের কোন অভিশাপ দেন, তবে তা মিথ্যে হবার নয়।'

"গান্ধারী পাণ্ডবদের কোন অভিশাপ দেন নি। কিন্তু তিনি কৃষ্ণকে নিষ্কৃতি দিলেন না। বললেন — মধুসূদন, তুমি কেন এই ভ্রাতৃযুদ্ধ হতে দিলে? ইচ্ছে করলেইতো তুমি এই যুদ্ধ বন্ধ করতে পারতে। দু-পক্ষই তোমার কথা শুনতো। কিন্তু তুমি তা করো নি। কেন করবে? তুমি যে কুরুকুলের বিনাশ চেয়েছো। তুমিই কুরুবংশ ধ্বংস করেছো। তবে তোমাকেও এর ফল ভোগ করতে হবে। শোনো, আমি ধর্মপরায়ণা ও সেবাপরায়ণা সতী। আমার বাক্য ব্রহ্মবাক্যের চেয়েও সত্য। আমার অভিশাপ অমোঘ ও অব্যর্থ। পতির সেবা-শুশ্রূষা করে আমি যে তপোবল অর্জন করেছি, তারই শক্তিতে আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি যেমন কুরুবংশকে ধ্বংস করেছো, তেমনি তুমি যদুবংশকেও ধ্বংস করবে।

"আজ থেকে ঠিক ছত্রিশ বছর পরে তুমি জ্ঞাতিহীন, অমাত্যহীন, পুত্রহীন ও বনচারী হয়ে অপকৃষ্ট উপায়ে নিহত হবে। আজ যেমন ভরতবংশের নারীরা স্বামী, পুত্র ও ভ্রাতার শোকে ভূলুণ্ঠিতা, তেমনি যদুবংশের নারীরাও সেদিন হাহাকার করবে।"

থামলেন সরকারদা। সঙ্গে সঙ্গে উমাদি কাশীদাসী মহাভারত থেকে আবৃত্তি আরম্ভ করে দিলেন —

'শুন কৃষ্ণ আজি শাপ দিব হে তোমারে।
তবে পুত্রশোক মোর ঘুচিবে অন্তরে॥
অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন।
জ্ঞাতিগণ হৈতে কৃষ্ণ হইনু নিধন॥
পুত্রগণ শোকে আমি যত পাই তাপ।
তুমি এ যন্ত্রণা পাবে দিলাম এ শাপ॥
মম বধূগণ যথা করিছে ক্রন্দন।
এই মত কান্দিবেক, তব বধূগণ॥

তুমি যেন ভেদ কৈলা কুরু পাণ্ডবেতে।
যদুবংশ তেন হবে আমার শাপেতে ॥
কৌরবের বংশ যেন হৈল সংহার।
শুন কৃষ্ণ এইমত হইবে তোমার ॥'

তিন

বাথরুম থেকে ফিরে এসে অবাক হই। বাণেশ্বর বেড-টি নিয়ে এসেছে। সবে সওয়া পাঁচটা। ছ'টার আগে তো বেড-টি আসে না।

বাণেশ্বর বলে, "ভোর সাড়ে চারটায় ওখা প্যাসেঞ্জার রাজকোট পৌঁছেছে। একটু পরেই কীর্তি একস্প্রেস এখানে আসবে। তাই ম্যানেজারবাবু গাড়ি জুড়বার ব্যবস্থা করতে স্টেশন-মাষ্টারের অফিসে চলে গিয়েছেন। যাবার সময় আমাদের ডেকে দিয়ে গেছেন।"

"তোমরা বুঝি ঘুম ভাঙতেই চায়ের জল চাপিয়ে দিলে?"

বাণেশ্বর মৃদু হাসে। আমি তার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করি, "কীর্তি একস্প্রেস তো পোরবন্দর যায়?"

"হ্যাঁ।"

"সে তাহলে আমাদের কতদূর নিয়ে যাবে?"

"জীতলসর জংশন পর্যন্ত। সেখান থেকে সোমনাথ মেল আমাদের গাড়ি ভেরাভল নিয়ে যাবে।"

বাণেশ্বর পাশের খোপে চা দিতে চলে যায়। আমি চায়ে চুমুক দিতে দিতে আমাদের গাড়ির কথা ভাবতে থাকি। আমাদের বর্তমান গাড়িটি একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর 'টু-টায়ার কোচ', দুটি 'লোয়ার' ও দুটি 'আপার বার্থ' নিয়ে এক একটি খোপ। লোয়ার বার্থ দুটির মাঝে একখানি 'স্টীল বেঞ্চ' বিছিয়ে কুণ্ডু কোম্পানী প্রতি খোপে পাঁচখানি করে বার্থের ব্যবস্থা করেছেন। এই রকম আটটি খোপ ও তিনটি

বাথরুম নিয়ে আমাদের গাড়ি। সাতটি খোপে যাত্রীরা রয়েছেন আর একটি খোপকে রন্ধনশালায় রূপান্তরিত করা হয়েছে।

'সই, কি আর বলসি মোরে।
কানুর পিরিতি ছাড়িতে নারিব
মরম কহিয়ে তোরে ॥······'

দাদা বোধ হয় বেড-টি শেষ করেই চণ্ডীদাসের কীর্তন শুরু করে দিয়েছেন। আমি মন দিয়ে শুনি। দাদা আপন মনে গেয়ে চলেছেন—

'গুরু পরিজন করাতিয়া গুণ
সে সব সহিতে পারি।
বন্ধুর বিচ্ছেদে জীবন না রহে
বুক বিদরিয়া মরি ॥
শুনহ সজনি দিবস রজনি
তাকিয়ে সঘন সারা।
হিয়া চমকিত শরে জরজর
অনিবারে বহে ধারা ॥
কুলবতী হঞা কুলের গরিমা
সকল হইল চূর।
নন্দের নন্দন করি নিরূপণ
সে করে এতেক দূর ॥······' *

দাদা গান থামাতেই পাশের খোপ থেকে বিউটি বলে ওঠে, "ও দাদু! কাল রাতে দেখি কত করে বললাম একটা গান গাইতে। তখন বললেন, গান জানি না। আর আজ গান গাইলেন যে বড়।"

দাদা মুখ টিপে হাসছেন। কথা বলছেন না। কীই বা বলবেন? কাল রাতে খাবার পরে গানের আসর বসেছিল। বিউটি ছিল প্রধান গায়িকা। সে বেশ ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। আরও অনেকে গান গেয়েছে গতকাল। কিন্তু দাদা রাজী হন নি। আর আজ নিজের

* চণ্ডীদাসের পদাবলী — বিমানবিহারী মজুমদার।

থেকেই গান গেয়ে ফেলেছেন। সুতরাং তিনি রীতিমত বিপদে পড়েছেন।

দাদু-নাতনীর কথা থাক্, নিজের কথা ভাবা যাক্। গাড়ি ছাড়তে দেরি আছে এখনও। এই অবসরে মানসীকে চিঠিখানা লিখে ফেললে হত। আবু-রোড ছাড়ার পরে আর তাকে চিঠি লেখা হয় নি। সে খুবই চিন্তার মধ্যে আছে। সেদিন আগ্রাফোর্ট স্টেশনে বারবার আমাকে বলেছে—প্রত্যেক জায়গা থেকে একখানি করে চিঠি দিও। চিঠি লেখার সময় না হলে, শুধু আমার নাম-ঠিকানা লিখে একখানি করে পোস্টকার্ড ডাকে দিয়ে দিও, সেই সাদা পোস্টকার্ড পেয়েই বুঝব, তুমি ভাল আছো।

আচ্ছা, আমিও তো তার কোন চিঠি পেলাম না। সেদিন বৃন্দাবনে খুকুর বিয়ের ঠিক হয়ে যাবার পরে পাত্রের বাবা বলে গিয়েছিলেন, পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলে তারিখটা তিনি জানিয়ে দেবেন মানসীকে। আর মানসী সেটা মাউণ্ট-আবু কিংবা দ্বারকার ঠিকানায় জানিয়ে দেবে আমাকে।

খুকু মানসীর পালিতা কন্যা হলেও নিজের মেয়ের মতোই সে তার বিয়ে দিচ্ছে। বিয়েতে মানসীর দাদা-বৌদি আসবেন বৃন্দাবনে। আমাকেও নাকি উপস্থিত হতে হবে।

তাহলে কি কোন কারণে খুকুর বিয়েটা ভেঙে গেল! খুকুকে সে মোটামুটি লেখাপড়া শিখিয়েছে। তার বয়স অল্প। দেখতে-শুনতে মেয়েটা ভালই। দেনা-পাওনা নিয়েও কোন গোলমাল নেই। কেবল মানসী স্বামী পরিত্যক্তা এমন একটা সংবাদ পাত্রপক্ষের কানে যাওয়াতেই যা একটু গোলমাল দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আমার সেদিনকার আকস্মিক উপস্থিতি তো পাত্রের পিতার সে ধারণার পরিবর্তন করে দিয়েছে। মানসীর অভিনয়ে তার স্বামী সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েই সেদিন তিনি হাসিমুখে বিদায় নিয়েছেন।

তাহলে তার একখানাও চিঠি এলো না কেন? কিছুই বুঝতে পারছি না। ব্যাগ থেকে ইন্‌ল্যাণ্ড লেটার নিয়ে মানসীর কাছে চিঠি

লেখা শুরু করি।

প্লাটফর্মের ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে যখন গাড়িতে ফিরে এলাম তখন চারিদিক ফর্সা হয়ে গিয়েছে। রোদ ওঠে নি অবশ্য।

যাবার দিন গোধূলির ম্লান আলোয় রাজকোটকে দেখেছিলাম, আজ প্রভাতী সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় তাকে দেখি। ভাল লাগে আমার। সুন্দর জায়গা। চমৎকার বাড়ি-ঘর, পথ ও প্রান্তর। পথের পাশে গাছের সারি। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি।

মনে হচ্ছে জলাভাব এখানেও রয়েছে। নইলে জলের কলে এমন লম্বা কলসীর সারি হবে কেন? ছেলে-মেয়ে আর নারী-পুরুষের দল ঘুম ভাঙতেই কলসী মাথায় ছুটে এসেছে কলের কাছে। ভরসার কথা ওখার মতো জলহীন নয় রাজকোটের জলের কল। কল থেকে জল পড়ছে।

ট্রেনের শব্দে সচকিত হয়ে উঠি। চারিদিক কাঁপিয়ে একটা ট্রেন এসে দাঁড়ালো স্টেশনে। ম্যানেজার বলে উঠল, "বেটার লেট খ্যান্ নেভার। কীর্তি এক্সপ্রেস এসে গিয়েছে।"

শান্টিং শুরু হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা যুক্ত হলাম কীর্তি এক্সপ্রেসের সঙ্গে। সকাল ঠিক সাতটার সময় গাড়ি ছাড়ল রাজকোট থেকে। ততক্ষণে আমাদের ব্রেক-ফাস্ট এসে গিয়েছে। যারা প্রভাসে শ্রাদ্ধ কিংবা তর্পণ করবেন, তাঁরা কেউ জল-খাবার স্পর্শ করলেন না। তাঁরা অনেকেই আবার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন। কি করবেন? বাথরুম জলহীন। প্রাতঃকৃত্য সারবার পর্যন্ত উপায় নেই। ম্যানেজার ভরসা দিয়েছে জীতলসরে জল পাওয়া যাবে।

খাবার খেতে খেতে গাড়ির জানালা দিয়ে রাজকোটকে দেখি, দেখি গান্ধীজীর গুজরাতকে। জীবনে আমি আমার যুগের অনেক মহা-পুরুষকেই দেখি নি। দেখি নি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও দেশবন্ধুকে। দেখি নি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ ও সর্দার প্যাটেল এবং আরও অনেককে। কিন্তু দেখেছি গান্ধীজী, জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রকে।

সুভাষচন্দ্রকে দেখেছি খুব ছোটবেলায় আমার জন্মভূমি বরিশালে। তখন আমি মাত্র চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। তাহলেও তাঁকে বেশ মনে আছে আমার।

মনে আছে গান্ধীজীকেও। তাঁকে আমি প্রথম দেখেছি নোয়াখালিতে। সেই কুখ্যাত হিন্দু নিধনের পরে একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে গিয়েছিলাম সেখানে। আমি তখন কলেজে পড়ি। কাজেই তাঁর কথা খুবই স্পষ্ট করে মনে পড়ছে আমার। মনে পড়ছে সোদপুরের তাঁর সেই দিনগুলোর কথা। কলকাতা থেকে কয়েকদিন তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছি সেখানে।

আর মনে পড়ছে সেই অভিশপ্ত দিনটির কথা—উনিশ শ' আটচল্লিশের তিরিশে জানুয়ারী। খবরটা সন্ধের কিছু আগে ছড়িয়ে পড়েছিল কলকাতার পথে পথে। দোকান পাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। সারা দেশে একটা গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছিল। আর তখুনি রেডিও থেকে ভেসে এসেছিল জওহরলালের ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠস্বর—'The light has gone out of the world'. একশ' পাঁচ বছর আগে পোরবন্দরের বুকে জাতির যে দীপশিখাটি জ্বলে উঠেছিল, ছাব্বিশ বছর আগে দিল্লীর বিড়লা ভবনে তাকে নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

না, নেবেনি। সে আলো নিভে যাবার নয়। কৃষ্ণ আর যীশুখৃষ্টের মতো, লেনিন আর আব্রাহাম লিঙ্কনের মতোই মহাত্মা গান্ধীও বেঁচে আছেন আমাদের মাঝে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর গুরুগৃহ রাজকোট! তুমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করো।

"ও মামু! কি ভাবছেন বসে বসে?" বিউটির প্রশ্নে আমার চিন্তা থেমে যায়। বাস্তবে ফিরে আসি। আমি তার দিকে তাকাই।

বিউটি আবার বলে, "কাকু মহাভারতের গল্প বলছেন। তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে।"

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াই। সরকারদার খোপে এসে বসি। সরকারদা বলতে শুরু করেন।

"গতকাল আমি আপনাদের স্ত্রীপর্ব পর্যন্ত মহাভারতের কৃষ্ণকথা বলেছি। তারপরে মহাভারতে আরও সাতটি-পর্ব আছে — শান্তি, অনুশাসন, আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণপর্ব। মৌষলপর্বে মহাভারতকার কৃষ্ণ-বলরামের দেহ-ত্যাগের কথা বলেছেন। অর্থাৎ শান্তিপর্ব থেকে মৌষলপর্বের সময়সীমা ছত্রিশ বছর।"

"তখন কৃষ্ণের বয়স কত ছিল?" সরকারদা থামতেই উমাদি প্রশ্ন করেন।

"আমি তো একদিন বলেছি যে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাল ১২৫ বছর।"

"সেটা তো শ্রীমদ্ভাগবদের মত।"

"হ্যাঁ।" সরকারদা স্বীকার করেন।

উমাদি বলেন, "কিন্তু শঙ্কু মহারাজের 'মধু-বৃন্দাবনে' বইতে পড়েছি — শ্রীকৃষ্ণ তিরানব্বই বছর বয়সে মর্তলীলা সাঙ্গ করেছেন।"

ম্যানেজার আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। একমাত্র সে-ই আমার লেখক পরিচয় টের পেয়েছে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বলি, "ওটা শঙ্কু মহারাজের নিজস্ব মত নয়। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন মাত্র।"*

"আমরা কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। আপনি কৃষ্ণকথা বলুন।" সত্যেনদা স্মরণ করিয়ে দেন।

সরকারদা শুরু করেন, "মৌষলপর্ব যদুবংশ ধ্বংসের উপাখ্যান। তার আগের চারিটি পর্বে শ্রীকৃষ্ণের কর্মলীলা খুব বেশি নয়। কারণ সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশসাধন এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য তিনি মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের বিজয়ে তাঁর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। তাহলেও শান্তি, অনুশাসন, আশ্বমেধিক ও আশ্রমবাসিকপর্বে যে কৃষ্ণকথা রয়েছে, আমি সংক্ষেপে তা আপনাদের বলছি। মৌষলপর্বের কথা পরে বলব।"

"বেশ, বলুন।"

* 'Krsna in History & Legend.'

সরকারদা বলতে থাকেন, "আপনারা জানেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে মহাত্মা ভীষ্ম আটান্ন দিন শরশয্যায় শায়িত ছিলেন। এই সময় নারদপ্রমুখ মহর্ষিগণ, পঞ্চপাণ্ডব, ধৃতরাষ্ট্র, সাত্যকি ও শ্রীকৃষ্ণ কয়েকবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। মহাজ্ঞানী ও মহাবীর ভীষ্ম তখন পাণ্ডবদের নানা উপদেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁদের রাজধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম-চরনিয়োষ-শুল্ক, রাজার মিত্র-দণ্ডবিধি-রাজকর-রাজকোষ-যুদ্ধনীতি, পিতা-মাতা ও গুরুর প্রতি ব্যবহার, আত্মজ্ঞান, কামনাত্যাগ, সৃষ্টিতত্ত্ব-সদাচার, বিষয়তৃষ্ণা, আসক্তিত্যাগ, অতিথি-সৎকার, ব্রাহ্মণসেবা, বিবাহভেদ, দানধর্ম ও সদাচার প্রভৃতি বিষয়ে বহু উপদেশ দান করেছিলেন। তাঁর সেই উপদেশাবলী অনুশাসনপর্ব বলে পরিচিত। এই পর্ব থেকে আজও যে কোন দেশের শাসকবর্গ শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেন। উপদেশ দানকালে একদিন কথায় কথায় যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে প্রশ্ন করলেন — আপনি জগৎপতি মহেশ্বরের নামকীর্তন করুন।

"ভীষ্ম সবিনয়ে বললেন — সে সাধ্য আমার নেই। মহাবাহু কৃষ্ণ একবার বদরিকাশ্রমে তাঁর তপস্যা করে তাঁকে তুষ্ট করেছিলেন। তিনিই তোমার অনুরোধ রক্ষা করবেন।

"সবাই কৃষ্ণের দিকে তাকালেন। কৃষ্ণ বললেন — ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং মহর্ষিগণও মহাদেবের সব তত্ত্ব জানেন না, মানুষ কি করে জানবে? তাহলেও তাঁর কিছু কথা আমি আপনাদের বলছি। একদিন জাম্ববতী আমাকে বলল, এর আগে তুমি একবার মহাদেবের আরাধনা করে রুক্মিণীর গর্ভে চারুদেষ্ণ, সুচারু, চারুবেশ, যশোধর, চারুশ্রবা, চারুযশা, প্রদ্যুম্ন ও শম্ভু এই আট পুত্র লাভ করেছো। আমাকেও তাদের মতো একটি ছেলে দাও।

" — আমি তখন গরুড়ের পিঠে চড়ে হিমালয়ে মুনিবর উপমন্যুর আশ্রমে গেলাম। তাঁর কাছে দীক্ষা নিলাম। মস্তকমুণ্ডন করে গায়ে ঘি মেখে দণ্ড-কুশ-চীর-মেখলা ধারণ করে মহাদেবের তপস্যা করতে থাকলাম।

"— ছ'মাস পরে হরপার্বতী আমার সামনে আবির্ভূত হলেন। মহাদেব আমাকে বরদান করলেন, তুমি যশস্বী পরমবলবান যোগসিদ্ধ লোকপ্রিয় ধর্মজ্ঞ ও যুদ্ধজয়ী হবে। তুমি সর্বদা আমার আপনজন থাকবে। তুমি শত শত পুত্র লাভ করবে।

"— মহাদেবীও আমাকে আটটি বর দিলেন, দ্বিজগণের প্রতি অক্রোধ, পিতার অনুগ্রহ, মাতার প্রসাদ, শতপুত্র লাভ, পরমভোগ, কুলে প্রীতি, শান্তিলাভ ও দক্ষতা। তিনি আমাকে আরও বললেন, তুমি মহাপ্রভাবান্বিত হবে, কখনও মিথ্যে বলবে না। তুমি এক হাজার ষোলজন সতী-সাধ্বী-স্ত্রী লাভ করবে। তোমার শরীর সর্বাঙ্গ সুন্দর ও কমনীয় হবে। তুমি বন্ধুপ্রিয় হবে। তোমার বাড়িতে প্রত্যহ সাত হাজার অতিথি আহার করবে।"

"— বরলাভ করে আমি মহাত্মা উপমন্যুর কাছে ফিরে এলাম। তিনি তখন খুশি হয়ে আমার কাছে মহাদেবের মাহাত্ম্য এবং স্থির স্থাণু প্রভু প্রবর বরদ বর ও সর্বাত্মা প্রভৃতি মহাদেবের অষ্টোত্তর শতনাম কীর্তন করলেন। হরপার্বতীর আরাধনা করেই আমি জাম্ববতীর পুত্র শাম্বকে লাভ করেছি।"

থামলেন সরকারদা। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারার আগেই তিনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন, "তারপরে মহাভারতে আমরা উল্লেখযোগ্য ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পাই আশ্বমেধিকপর্বে। ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণের পরে যুধিষ্ঠির বড়ই বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণ তখন তাঁকে বললেন — মহারাজ, বেশি শোক করলে পরলোকগত আত্মীয়রা সন্তপ্ত হন। আপনি এখন প্রকৃতিস্থ হয়ে যাগ-যজ্ঞ ও দান-ধ্যান করুন। দরিদ্রদের তুষ্ট করুন তাহলেই আপনার আত্মীয়দের আত্মা তুষ্ট হবেন।

"তারপরে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে প্রচুর দান করার পরামর্শ দিলেন। আর কৃষ্ণ তাঁর কাছে কামগীতা বর্ণনা করলেন। বললেন — মহারাজ, আপনার কাজ যেমন শেষ হয় নি, তেমনি আপনি সব শত্রুকেও জয় করেন নি। অহংবুদ্ধি রূপ শত্রু

এখনও আপনার মনকে অধিকার করে রয়েছে। আপনি নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। তাকে পরাজিত করুন। শোক ত্যাগ করে রাজ্যশাসন করুন। কামনা ত্যাগ করে দক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে আপনি ইহলোকে কীর্তি ও পরলোকে উত্তম গতি লাভ করবেন।"

"আচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণ কখন কার কাছে অনুগীতা বর্ণনা করেছিলেন?" সরকারদা থামতেই কল্পনাদি প্রশ্ন করলেন।

সরকারদা উত্তর দেন, "আশ্বমেধিকপর্বে অর্জুনের কাছে।"

"একটু বলুন না।" কল্পনাদি অনুরোধ করেন।

সরকারদা বলতে শুরু করেন, "এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণ ধর্মাত্মা কশ্যপকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, কৃষ্ণ সেদিন সেই কথাই শুনিয়েছিলেন। সেদিন তাঁর পক্ষে ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বলা সম্ভব হয় নি। কারণ তিনি তখন যোগযুক্ত ছিলেন না। সেদিন কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন— মানুষ পুণ্যকর্মের ফলে উত্তম গতি পায়। দেহধারী জীব দুর্বুদ্ধির বশে অতিভোজন ও সুরাপান করে, দিনে ঘুমায় ও রাতে অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ করে। ফলে সে বায়ুপিত্তাদি প্রকোপিত করে এবং রোগে আক্রান্ত হয়।

"—দেহত্যাগের সময় শরীরের উষ্মা বায়ু প্রকোপিত হয়ে তার মর্মস্থল ভেদ করে। তখন তার জীবাত্মা বেদনাগ্রস্ত হয়ে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। সব জীবই বার বার জন্ম মৃত্যু ভোগ করে। তারা জন্ম ও মৃত্যু দু-সময়েই কষ্ট পায়। মৃত্যুর পরেও কৃতকর্ম মানুষকে ত্যাগ করে না। তাই তার আবার জন্ম হয়।

"—শুক্র ও শোণিত মিলিত হয়ে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে জীবের কর্ম অনুসারে দেহে পরিণত হয়। দেহের অধিষ্ঠাতা জীবাত্মা অতি সূক্ষ্ম এবং অদৃশ্য। তিনি সর্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত, শাশ্বত ব্রহ্ম ও সর্বপ্রাণীর বীজস্বরূপ। জীবাত্মা দেহকে সচেতন ও চেতনা শরীরকে সংবেদনশীল করে তোলে।

"—যতদিন মোক্ষজ্ঞান না হয়, ততদিন জীবকে জন্মজন্মান্তর ভোগ

করতে হয়। জীব যখন বুঝতে পারে সুখদুঃখ অনিত্য, শরীর অপবিত্র বস্তুর সমষ্টি, বিনাশ কর্মেরই ফল এবং সব সুখই দুঃখ, তখন সে এই ঘোর সংসারসাগর অতিক্রম করতে পারে। মরণশীল প্রাণীর দেহে যিনি একই চৈতন্যময় সত্ত্ব দর্শন করেন, কেবল তিনিই পরম-পদ প্রাপ্ত হন।

"— যিনি সবার মিত্র সর্ব সহিষ্ণু শান্ত পবিত্রস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয়, যাঁর ক্রোধ ভয় ও অভিমান নেই, যিনি সর্বভূতের আত্মীয়, যাঁর কাছে জন্ম মৃত্যু সুখ-দুঃখ লাভ-অলাভ প্রিয়-অপ্রিয় সবই সমান এবং যিনি আকাঙ্ক্ষাশূন্য, ধার্মিক-অধার্মিক কিছুই নয় ও ধর্ম-অর্থ-কাম পরিহার করেছেন, তিনিই আত্মাকে উপলব্ধি করে মুক্তিলাভ করেন। যিনি সর্বসংস্কারমুক্ত এবং কিছুই নিজের বলে মনে করেন না, তিনিই সনাতন অক্ষয় ব্রহ্ম লাভ করেন। তপস্যা দিয়ে মনকে ইন্দ্রিয়মুক্ত করে একান্তমনে যোগরত হলে হৃদয়ে পরমাত্মার দর্শন পাওয়া যায়।" থামলেন সরকারদা।

"কেবল কৃষ্ণের উপদেশের কথাই বলছেন কাকু! কৃষ্ণের কাহিনী বলুন না।" বিউটির কথা শুনে বুঝতে পারছি, তত্ত্বকথা তার ভাল লাগছে না। ভাল হয়তো অনেকেরই লাগে নি। তবে সেকথা বলল কেবল বিউটি।

মৃদু হেসে সরকারদা বলেন, "কি করব মা! তাঁর মহাজীবনটাই যে একটা উপদেশ। যাই হোক, সংক্ষেপে পরের কাহিনী বলছি শোন। তারপরে কৃষ্ণ একদিন পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হস্তিনাপুর থেকে দ্বারকা রওনা হলেন। বিদায় বেলায় যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন — পুণ্ডরীকাক্ষ, যাচ্ছ যাও। কিন্তু আমার অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় আবার এখানে এসো।

"সুভদ্রাকে সঙ্গে করে কৃষ্ণ দ্বারকায় এলেন। কৃষ্ণ পিতা বসুদেবকে কুরুপাণ্ডবযুদ্ধের বিবরণ দিলেন। দৌহিত্র অভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদে বসুদেব প্রথমে অত্যন্ত কাতর হলেন। কিন্তু পরে অভিমন্যুর বীরত্বের কথা শুনে তিনি শোক সংবরণ করলেন।

"হস্তিনাপুরে তখন বিরাটকন্যা উত্তরা পতিশোকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। একদিন ব্যাসদেব সেখানে গিয়ে উত্তরাকে বললেন — অনাহারের ফলে তোমার গর্ভস্থ সন্তান ক্ষীণ হচ্ছে। যশস্বিনি, শোক ত্যাগ কর। তোমার মহাতেজা পুত্র হবে। বাসুদেবের প্রভাবে ও আমার আশীর্বাদে সে পাণ্ডবদের পরে ভারত শাসন করবে।

"পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় সমাগত হল। ভগ্নী সুভদ্রা, ভ্রাতা গদ, পুত্র প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও শাম্ব এবং সাত্যকি, কৃতবর্মা ও বলরাম প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গেলেন। গিয়েই শুনলেন উত্তরা একটি মৃতপুত্র প্রসব করেছেন। কৃষ্ণ ব্যথিত হৃদয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। বুঝতে পারলেন, পিতৃশোকে উন্মাদ হয়ে অশ্বত্থামা সেদিন কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের ওপরে যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন, তারই ফলে তাঁদের এই শেষ বংশধরটিও মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছে। কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য পুরনারীরা পুরাণপুরুষকে ঘিরে ধরলেন। কাঁদতে কাঁদতে কুন্তী বললেন — বাসুদেব, তুমিই আমাদের একমাত্র গতি। এই বালক আমার শ্বশুরকুলের পিণ্ডদাতা। তুমি বলেছিলে একে পুনর্জীবিত করবে। এখন সেই প্রতিশ্রুতি পালন কর।

"দ্রৌপদী কৃষ্ণকে নিয়ে সূতিকাগৃহে এলেন। উত্তরা করুণস্বরে বললেন — পুণ্ডরীকাক্ষ! দেখুন, আমি পুত্রহীনা হয়েছি। আমিও এখন অভিমন্যুর মতোই নিহত। আমার আশা ছিল পুত্রকে কোলে নিয়ে আপনাকে প্রণাম করব। আপনি দ্রোণপুত্রের ব্রহ্মাস্ত্রে বিনষ্ট আমার পুত্রকে বাঁচিয়ে তুলুন।

"এতক্ষণ পরে কৃষ্ণ প্রথম কথা বললেন। তিনি শান্তস্বরে উত্তরাকে বললেন — আমার কথা মিথ্যে হবার নয়। সবার সামনেই আমি তোমার ছেলেকে পুনর্জীবিত করছি। যদি আমি কখনও মিথ্যে না বলে থাকি, যদি ধর্ম আমার সহায় ও ব্রাহ্মণগণ আমার প্রিয় হয়ে থাকেন, তবে অভিমন্যুর এই পুত্র জীবনলাভ করুক। যদি অর্জুনের সঙ্গে কখনও আমার মনোমালিন্য না হয়ে থাকে, যদি আমি কেশীদৈত্য

ও কংসকে ধর্ম অনুসারে বধ করে থাকি, তাহলে এখুনি তোমার এই ছেলে বেঁচে উঠবে।

"অচিন্ত্যাত্মা মধুসূদনের বাক্য মিথ্যে হবার নয়। ধীরে ধীরে সেই মৃতশিশু চেতনা লাভ করল। সে নড়ে উঠল। নবজাতকের কান্নায় পাণ্ডবপুরী হেসে উঠল।

"উত্তরা ছেলেকে কোলে নিয়ে কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ শিশুকে রত্ন উপহার দিলেন। বললেন — ভরতবংশ পরিক্ষীণ হবার পরে অভিমন্যুর এই পুত্র জন্মেছে বলে আমি এর নাম রাখলাম 'পরীক্ষিৎ'।"

"কৃষ্ণ মরা ছেলেকে বাঁচিয়ে তুললেন!" সরকারদা থামতেই বিউটি বলে উঠল।

সরকারদা মাথা নেড়ে উত্তর দেন, "হ্যাঁ।"

বিউটি মন্তব্য করে, "একেবারে গাঁজা।"

"না"। আমি বলি। বিউটি সহ সবাই সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকায়। আমি বিউটিকে বলতে থাকি, "তুমি কলেজ থেকে বঙ্কিম-চন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র বইখানি এনে একবার পড়ে দেখো। শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে তোমার অনেক সন্দেহের অবসান হবে।"

"তা বঙ্কিমচন্দ্র এই ঘটনাটি সম্বন্ধে কি বলেছেন?"

"বলেছেন — 'অভিমন্যুপত্নী উত্তরা একটি মৃত পুত্র প্রসব করিলেন। কৃষ্ণ তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন। কিন্তু ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে কৃষ্ণ ঐশী শক্তির প্রয়োগদ্বারা এই কার্য সম্পাদন করিলেন। এখনকার অনেক ডাক্তারেই মৃতসন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন এবং কিরূপে করিতে পারেন, যাহা আমরা অনেকেই জানি। ইহা দ্বারা কেবল ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, যাহা তখনকার লোক আর কেহ জানিত না, কৃষ্ণ তাহা জানিতেন। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এজন্য সর্বপ্রকার বিদ্যা ও জ্ঞান তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল'।"

চার

সকাল সওয়া ন'টায় জীতলসর জংশনে পৌঁছলাম। এখানে কীর্তি এক্সপ্রেসকে দু-টুকরো করা হবে। এক টুকরো এখান থেকে আরও কয়েকখানি গাড়ি নিয়ে পোরবন্দর চলে যাবে। তারই নাম হবে কীর্তি এক্সপ্রেস। পোরবন্দর শুধু মহাত্মাজীর জন্মভূমি নয়, পোরবন্দর সেকালের সুদামাপুরী। তাহলেও এ যাত্রায় পোরবন্দর দর্শন করা হল না আমার।

কীর্তি এক্সপ্রেসের পরিত্যক্ত অংশকে জুড়ে দেওয়া হবে সোমনাথ মেলের সঙ্গে। আমাদের গাড়ি সেই অংশের অংশীভূত। সুতরাং আমরা পড়ে রইলাম জীতলসর জংশনে।

ঠাকুরমারা যথারীতি বাসি কাপড়ের বালতি নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন। ম্যানেজার বলেছে এখানে নাকি জল আছে। ঠাকুরমারা তিনজনেই পূর্ববঙ্গের মানুষ। কাজেই জলটা তাঁদের একটু বেশি লাগে। দৈনিক স্নান করতেই হয়, অন্তত দু'বার জামা-কাপড় ছাড়তে হয়। গাড়িতে জলাভাব বলে তাঁরা ছাড়া জামা-কাপড় বালতিতে জমিয়ে রাখেন কোন স্টেশনে জল পেলেই বেয়ারাকে বকশিষ দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিংরুম দখল করে নেন। সেই চেষ্টাতেই এখন গেলেন বোধ হয়।

ঠাকুরমাদের তিনজনেরই বয়স সাতের ঘরে। তাঁরা কেউ কারও আত্মীয়া নন। এমনি তীর্থদর্শনে বেরিয়েই তাঁদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল। সেই থেকে তাঁরা একত্রে তীর্থদর্শন করে চলেছেন। বয়সের ভারে তাঁরা মোটেই কাহিল হয়ে পড়েন নি, সম্পূর্ণ সচল রয়েছেন। তিনজনেই ভ্রমণপটু। তাঁরা সবার আগে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং সবার আগে দর্শন সেরে গাড়িতে ফিরে আসেন। তাঁদের নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণযোগ্য।

উকিলবাবু গাড়ি থেকে নামছেন। একটু অবাক হই। তিনি সাধারণতঃ তাঁর স্ত্রীর পায়ের কাছে কাঠের জলচৌকিখানির ওপরেই বসে থাকেন। সেখানি তিনি সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছেন। তাঁর স্ত্রী অতিশয়া স্থূলাঙ্গী। তাই উঁচু সিঁড়ি ভাঙ্গতে হলেই ওখানির সাহায্য লাগে। উকিলবাবু আপার বার্থ পেয়েছেন। সব সময় সেখানে বসে থাকা সম্ভব নয়। অথচ মিসেস উকিল সাধারণতঃ শুয়েই থাকেন এবং তিনি শোবার পরে তাঁর বার্থে আর কারও বসার জায়গা থাকে না। কাজেই উকিলবাবুকে মিসেসের পায়ের কাছে জলচৌকিতে আশ্রয় নিতে হয়।

উকিলবাবুর বয়স সাতের কোঠায়। তাহলেও তিনি সম্পূর্ণ সচল। কিন্তু তিনি কখনও কোন মন্দিরে প্রবেশ করেন না। আর মিসেস তাঁর বিশাল বপু নিয়ে প্রতিটি মন্দির দর্শন করেন। কারণ জিজ্ঞেস করায় উকিলবাবু সহাস্যে বলেছেন, "সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য, নহিলে ঝামেলা বাড়ে।"

সঙ্গে সঙ্গে সাহাবাবু বলেছেন, "স্বামী পুণ্য করলে স্ত্রী অর্ধেক ভাগ পান কিন্তু স্ত্রী পুণ্য করলে স্বামী তার এক কণাও লাভ করেন না।"

উকিলবাবু কোন মন্তব্য করেন নি, কিন্তু তার পরেও তিনি কোন মন্দিরে যান নি। সহযাত্রীরা অনেকে তাই আড়ালে উকিলবাবুকে বলেন—'Wife's attendent'.

ম্যানেজার ছুটে আসে। বলে, "গাড়িতে উঠুন। শান্টিং হবে। জল পাওয়া গিয়েছে।"

খুবই সুসংবাদ। গতকাল বিকেল থেকেই গাড়ির ট্যাঙ্ক জলশূন্য। তাড়াতাড়ি উঠে আসি গাড়িতে।

একটু বাদেই একটা শান্টিং ইঞ্জিন এসে আমাদের গাড়িকে জলের পাইপের কাছে নিয়ে আসে। আর তারপরেই রেল কর্মীদের প্রতীক্ষা না করে স্বয়ং ম্যানেজার সদলবলে গাড়ির ছাদে ওঠে। কর্মীরা আসার আগেই গাড়ির ট্যাঙ্ক জল বোঝাই হয়ে যায়।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন অমিয়বাবু। গাড়িতে উঠে স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেললেন। ভদ্রলোক এখনও হাঁপাচ্ছেন।

জিজ্ঞেস করি, "এমন হাঁপাচ্ছেন কেন?"

"হাঁপাবো না। আপনারা যে আমাকে এখানে ফেলে পালাবার তালে ছিলেন।"

বুঝতে পারি ব্যাপারটা। উনি যখন গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিলেন, তখন গাড়িটা ছিল পাশের প্লাটফর্মে। তারপরে জল ভরবার জন্য গাড়ি নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। ফিরে এসে গাড়ি খুঁজে পেতে ভদ্রলোকের একটু বেগ পেতে হয়েছে আর কি।

জিজ্ঞেস করি, "তা শেষ পর্যন্ত গাড়ি খুঁজে পেলেন কেমন করে?"

ওপরদিক দেখিয়ে অমিয়বাবু বলেন, "সবই তাঁর ইচ্ছে। রাখে কৃষ্ণ মারে কে? হঠাৎ দেখতে পেলাম ম্যানেজার একটা গাড়ির ছাদে উঠে জল ভরছেন। বুঝলাম এটাই আমাদের গাড়ি। ভাগ্যিস ম্যানেজার গাড়ির ছাদে উঠেছিলেন।"

সহযাত্রীরা হেসে ওঠেন। অমিয়বাবু এমনিতেই মজার মানুষ। একমাত্র অসুবিধে তাঁর সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলতে হয়। কারণ তিনি কানে বেশ একটু খাটো। ভদ্রলোকের বয়স পাঁচের ঘরে। রোগা ও কালো চেহারা। অকৃতদার। কাজকর্মও করেন না কিছু। বাবা একখানি বাড়ি রেখে গিয়েছেন। তারই ভাড়া থেকে বেশ চলে যায়।

হাসি থামার পরে আমার দিকে একখানি হাত বাড়িয়ে দিয়ে অমিয়বাবু বলেন, "দাদা, একটু প্রসাদ দিন।"

পকেট থেকে নস্যির কৌটোটা বের করে তাঁর হাতে দিই।

সেজদি মানে মিসেস সাহা বলেন, "তাহলে তো ঠাকুরমাদেরও গাড়ি খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। ম্যানেজারবাবুও ছাদ থেকে নেমে পড়েছেন।"

অমিয়বাবু প্রতিবাদ করেন, "ওঁদের কি আমার মতো বোকা ভেবেছেন। ওদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল।"

আবার হাসি। আর সে হাসি থামবার আগে বালতি বোঝাই

ভিজে জামা-কাপড় নিয়ে ঠাকুরমারা একে একে গাড়িতে উঠে এলেন।

সকাল দশটায় ট্রেন ছাড়ল। রাজকোট থেকে ভেরাভল ১৮৬ ও জীতলসর থেকে ১০৮ কিলোমিটার। এই পথটুকু যেতে আমাদের সোয়া তিন ঘন্টা সময় লাগবে। কারণ নামে মেল হলেও প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে ট্রেন থামবে। পথে পড়বে জুনাগড়।

কিন্তু থাক্, জুনাগড়ের কথা এখন নয়। তার চেয়ে সরকারদার খোপে যাওয়া যাক্। সেখানে কৃষ্ণকথার আসর বসেছে। প্রভাস পৌঁছবার আগে মৌষলপর্বের কাহিনীটা ঝালিয়ে নেওয়া যাক্।

তাড়াতাড়ি এসে সত্যেনদার পাশে বসি। সত্যেনদার পুরো নাম সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বয়সে প্রৌঢ়। সহজ সরল সাদাসিধে স্নেহপরায়ণ মানুষ। তাঁর মমতাময়ী মাকে নিয়ে তীর্থে এসেছেন। আমিও তাঁর মাকে মা বলেই ডাকছি।

সরকারদা শুরু করেন, "সহযাত্রীগণ, এখন আমি আপনাদের কাছে মহাভারতের মৌষলপর্বের কাহিনী বলছি। এটি আমার কৃষ্ণকথার শেষ বিষয়। গত কয়েকদিন ধরে আমি শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে যা বলেছি, তা সেই মহাজীবনের অতি সামান্য অংশ মাত্র। তা হলেও আশাকরি সেই পুরাণপুরুষের কিছু কথা আপনারা জানতে পেরেছেন।"

আমরা মাথা নাড়ি। সরকারদা বলতে থাকেন, "আমি আপনাদের যে কৃষ্ণকথা বললাম, তা মহাভারতের। আপনারা জানেন পাণ্ডবদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যা করেছেন, তা ছাড়া অন্য কোন কৃষ্ণবৃত্তান্ত মহাভারতে নেই। যাই হোক্ আমি এখন মহাভারতের মৌষল-পর্বের কথা বলছি।

"যুদ্ধজয়ের পরে ছত্রিশ বছর পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করে-ছিলেন। রাম-কৃষ্ণ সহ যাদবরাও এই ছত্রিশ বছরই বেঁচেছিলেন। কিন্তু এই সময়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দেখা হবার কোন কথা মহাভারতে নেই।"

"ব্যাপারটা, একটু বিস্ময়কর।" উমাদি মন্তব্য করেন।

সরকারদা কিছু বলতে পারার আগেই আমি বলি, "আর তাই মৌষলপর্বটি মূল-মহাভারতের অংশ কিনা সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।"

"তিনি কি বলেছেন মামু?" বিউটি জিজ্ঞেস করে।

আমি উত্তর দিই, "বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্রে বলেছেন — 'মৌষল-পর্বটি মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত নহে বলিয়াই বোধ হয়। যাহা পুরাণ ও হরিবংশে আছে, কৃষ্ণজীবনঘটিত এমন আর কোন ঘটনাই মহাভারতে নাই।...এইটিই কেবল সে নিয়মবহির্ভূত।... আমার বিবেচনায় পরীক্ষিতের জন্মই আদিম মহাভারতের শেষ। তার পরবর্তী যে সকল কথা, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের'।"

আমি শেষ করার পরেও সরকারদা চুপ করে রয়েছেন। তিনি বোধ হয় একটু নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছেন। তাই তাড়াতাড়ি বলি, "একি! চুপ করে রয়েছেন কেন? মৌষলপর্বের কথা বলুন।"

"বলব। কিন্তু তার আগে শ্রীমদ্ভাগবদের কয়েকটি কথা বলে নিতে চাই।"

"বেশ তো বলুন।"

সরকারদা শুরু করেন, "শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করেছেন, কিন্তু তিনি মথুরার সিংহাসনে বসেন নি। তিনি মাতামহ উগ্রসেন তার মানে কংসের পিতাকেই মথুরার সিংহাসনে বসিয়ে-ছিলেন। অথচ তিনি রাজা না হয়েও নিরলস ভাবে রাজকর্ম করে গিয়েছেন। তাঁর আশা ছিল মথুরাকে তিনি এক কল্যাণরাষ্ট্রে রূপান্তরিত করবেন।

"পারেন নি। জরাসন্ধের জন্য শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে যাদবদের নিয়ে দ্বারকায় পালিয়ে আসতে হয়েছিল। তবে সেখানে তিনি তাঁর স্বপ্নকে সফল করতে পেরেছিলেন। দ্বারকা কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এখানেও তিনি রাজা হন নি।

"উগ্রসেনকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি তাঁর সেবক রূপে কাজকর্ম সম্পাদন করতেন। যদুবংশের আটটি শাখা থেকে দশজন জ্ঞানী

গুণী ও অভিজ্ঞকে নিয়ে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করেন। নিজের শিক্ষাগুরু অবন্তীপুরের অধ্যাপক সন্দীপনি মুনিকে রাষ্ট্রের প্রধান ব্যবস্থাপকের পদে অভিষিক্ত করেছিলেন।

"শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাবাসীদের সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধার দিকে সর্বদা নজর রাখতেন। তিনি এখানে চাতুর্বণ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। হরিবংশে বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ একদিন রাতে সঞ্চয়ী যক্ষদের বাড়িতে ডেকে এনে তাঁদের গুপ্তধন দরিদ্রদের মধ্যে সমান ভাবে বিলিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবং বলা বাহুল্য সে নির্দেশ পালিত হয়েছিল।

"প্রাগজ্যোতিষপুরে নরকাসুর দেবমাতা অদিতির কুণ্ডল চুরি করেছে জানতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে যান। দেব-সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য তিনি নরকাসুরকে বধ করেন। তারপরে দেখতে পান, নরকাসুর বিভিন্ন দেশের রাজবধূ ও রাজকন্যাদের ধরে এনে বন্দী করে রেখেছে। শ্রীকৃষ্ণ সেই অপহৃতা ও ধর্ষিতা নারীদের উদ্ধার করলেন। নিজের স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে তিনি তাঁদের সামাজিক মর্যাদা দান করেছিলেন।"

"অশেষ গুণশালী হয়েও শ্রীকৃষ্ণ কখনও কোন উচ্চপদ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু তিনিই ছিলেন দ্বারকার প্রকৃত শাসক। তাঁর সুশাসনে দ্বারকায় কোন ভিক্ষুক কিংবা ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ ছিল না। আর তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেই বোধ হয় দ্বারকার মানুষ শিক্ষিত ও নির্লোভ হয়েছিলেন। তাঁরা সবাই ছিলেন স্বাস্থ্যবান, সমৃদ্ধ ও সৎচরিত্র।

"অথচ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে ছত্রিশ বছরের মধ্যে সেই দ্বারকার যাদবগণ অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠলেন। একদিন বিশ্বামিত্র কণ্ব ও নারদ দ্বারকায় এলেন। সুভদ্রার ভাই সারণ ও তাঁর কয়েক বন্ধুর মাথায় এক কুবুদ্ধি এল। তাঁরা কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে মেয়ে সাজিয়ে মুনিদের সামনে নিয়ে গেলেন। বললেন — ইনি যাদববীর বভ্রুর পত্নী, সন্তানসম্ভবা ও পুত্রাভিলাষী। বলুন তো ইনি কি প্রসব করবেন?

"বলা বাহুল্য মুনিরা তাঁদের প্রতারণা বুঝতে পারলেন। তাঁরা অভিশাপ দিলেন — এই কৃষ্ণপুত্র শাম্ব একটি ঘোর লৌহমুষল প্রসব

করবে। সেই মুষলের প্রভাবে বলরাম ও কৃষ্ণ ছাড়া যদুবংশের সকলেই নিহত হবে। বলরাম সমুদ্রে দেহরক্ষা করবেন আর জরা নামে এক ব্যাধ কৃষ্ণকে বাণবিদ্ধ করবে।

"যথাসময়ে কথাটা কৃষ্ণের কানে এলো। কিন্তু তিনি কোন প্রতিকার করলেন না। পরদিনই শাম্ব মুষল প্রসব করলেন। রাজা উগ্রসেন মুষলটি চূর্ণ করিয়ে সাগরে ফেলে দিলেন। তিনি আদেশ দিলেন — দ্বারকায় কেউ সুরা তৈরি করতে পারবে না। যে এই আদেশ লঙ্ঘন করবে, তাকে সপরিবারে শূলে চড়ানো হবে।

"তা সত্ত্বেও যাদবগণের নির্লজ্জ পাপাচার প্রশমিত হল না। তারপরেই দ্বারকায় নানা দুর্লক্ষণ দেখা যেতে থাকল। অবশেষে এক ত্রয়োদশীতে অমাবস্যা দেখে কৃষ্ণ যাদবদের বললেন — আমাদের বিনাশ আসন্ন। তোমরা তাড়াতাড়ি প্রভাসতীর্থে চলে যাও।"

"আমরা এখন সেই প্রভাসে চলেছি কাকু?" মাঝখান থেকে বিউটি বলে উঠল।

"হ্যাঁ, মা!" সরকারদা সহাস্যে উত্তর দেন। তিনি বলতে থাকেন, "বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ প্রচুর মদ ও মাংস সহ তাঁদের পরিবারবর্গ, সৈন্য-সামন্ত ও বারবধূদের নিয়ে প্রভাসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা নিরন্তর নারীসঙ্গ ও মদ্যপান করতে থাকলেন। একদিন সাত্যকি, গদ, বভ্রু ও কৃতবর্মা কৃষ্ণের সামনেই সুরাপান শুরু করে দিলেন।"

"তারপরেই মাতাল সাত্যকি কৃতবর্মার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধালেন। বললেন — তুমি ক্ষত্রিয় হয়ে একজন নিদ্রামগ্ন ক্ষত্রিয়কে বধ করেছো। যাদবরা কোনদিন তোমাকে ক্ষমা করবে না। প্রদ্যুম্ন তাঁকে সমর্থন করলেন।

"কৃতবর্মাও ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি বললেন — তুমিও তো হাতকাটা ভূরিশ্রবাকে কাপুরুষের মতো হত্যা করেছো।

"সাত্যকি তখন সত্যভামার সামনেই বলে ফেললেন — আর তুমি যে অক্রূরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শতধন্বাকে দিয়ে সত্যভামার পিতা সত্রাজিৎকে বধ করিয়েছো।

"বাবার মৃত্যুর কথা মনে পড়তেই সত্যভামা ছুটে গেলেন কৃষ্ণের কাছে। তিনি তাঁর কোলে বসে কাঁদতে শুরু করে দিলেন। কৃষ্ণ কিছুই বললেন না। কি বলবেন? তিনি অন্তর্যামী। এই আত্মকলহের পরিণতি তাঁর অজানা ছিল না।

"সাত্যকি তখন উঠে দাঁড়ালেন। তিনি সত্যভামাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন — এই পাপাত্মা কৃতবর্মার সাহায্যে অশ্বত্থামা চোরের মতো নিদ্রিত ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রোপদীর পুত্রদের হত্যা করেছিল। তাঁরা যেখানে গিয়েছে, আজ ওকেও আমি সেখানে পাঠাচ্ছি। বলেই তিনি খড়্গ দিয়ে কৃতবর্মার শিরশ্ছেদ করলেন। তারপরে তিনি কৃতবর্মার সমর্থকদেরও মারতে থাকলেন।

"অন্ধক, ভোজ, বৃষ্ণি ও কুকুর প্রভৃতি যদুবংশের বিভিন্ন শাখার বীরগণ তখন পৃথক পৃথক দলে ভাগ হয়ে মারামারি শুরু করে দিলেন। সাত্যকি ও প্রদ্যুম্ন নিহত হলেন।

"সত্যভামাকে কোল থেকে নামিয়ে কৃষ্ণ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি একমুঠো এরকা বা হোগলা হাতে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো বজ্রতুল্য লৌহ-মুষলে পরিণত হল। সেই মুষলের সাহায্যে তিনি সামনে যাঁকে পেলেন, তাঁকেই হত্যা করতে থাকলেন।

"প্রভাসের সমস্ত এরকাই মুষলে পরিণত হল। যাদবরা মুষল দিয়ে একে অপরকে হত্যা করতে থাকলেন। তাঁরা জ্ঞাতি হত্যায় মেতে উঠলেন। বাবা ছেলেকে মারলেন, ভাগনে মামাকে, ভাই ভাইকে। কৃষ্ণের সামনেই গদ, শাম্ব, চারুদেষ্ণু ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতি নিহত হলেন।

"বভ্রু ও দারুক তখন কৃষ্ণকে বললেন — ভগবান, আপনি বহু লোককে বিনষ্ট করেছেন। চলুন, এখন আমরা সাগরতীরে যাই। সেখানে বলরাম বসে আছেন।

"সাগরতীরে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, বলরাম একা গাছের ছায়ায় বসে অনন্ত সাগরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন, তিনি সাগরে দেহরক্ষা করার কথা ভাবছেন। কৃষ্ণ তখন দারুককে বললেন

—তুমি হস্তিনাপুরে চলে যাও। অর্জুনকে গিয়ে বলো যদুবংশ ধ্বংস হয়েছে। তাকে নিয়ে এসো এখানে।

"তারপরে কৃষ্ণ বভ্রুকে বললেন—তুমি গিয়ে যাদব-নারীদের রক্ষা করো। দেখো, দস্যুরা তাঁদের যেন অপহরণ না করে।"

"বভ্রু মেয়েদের কাছে পৌঁছবার আগেই একজন ব্যাধ তাঁকে হত্যা করল। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলরামকে বললেন—আমি মেয়েদের রক্ষা করতে যাচ্ছি। আমি না ফিরে আসা পর্যন্ত আপনি এখানে অপেক্ষা করুন।

"কৃষ্ণ এলেন পিতা বসুদেবের কাছে। তাঁকে বললেন—আপনি মেয়েদের নিয়ে দ্বারকায় চলে যান। দাদা সাগরতীরে তপস্যায় বসেছেন, আমি তাঁর কাছে চলে যাচ্ছি। তিনি পিতাকে প্রণাম করলেন—শেষ প্রণাম। যে পিতাকে কংসের কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য বৃন্দাবনচন্দ্র একদিন বৃন্দাবন ত্যাগ করেছিলেন, যে পিতা ও পিতৃকুলের নিরাপত্তার প্রয়োজনে একদিন মথুরানাথকে মথুরা থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল, সেই পিতা বসুদেবকে শেষ প্রণাম করলেন পুত্র বাসুদেব।

"নারী ও শিশুরা কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালেন, ঠিক যেমন করে একদিন ব্রজগোপীরা গোপীনাথের পথ আগলে দাঁড়িয়েছিলেন।

"সেদিন ব্রজনারীরা যা পারেন নি, আজ যদুনারীরাও তা পারলেন না। নিষ্ঠুর রাসবিহারী সেদিন বলেছিলেন—'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি'—স্থূলভাবে আমি চলে যাচ্ছি বটে কিন্তু সূক্ষ্মভাবে আমি বৃন্দাবন ছেড়ে এক পা-ও যেতে পারি না। আমি বৃন্দাবনেই চির-বিরাজমান। আজ যদুনাথ বললেন—সব্যসাচী এখানে আসছে সে, তোমাদের দুঃখ মোচন করবে।

"সাগরতীরে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, বলরাম দেহত্যাগ করেছেন। কৃষ্ণ কিছুক্ষণ সেই বনে পায়চারি করলেন। তারপরে তিনি ইন্দ্রিয় দমন করে তপস্যায় রত হলেন।

"আর ঠিক তখুনি জরা নামে জনৈক ব্যাধ দূর থেকে কৃষ্ণের চরণ দুখানি দেখতে পেলেন। তিনি হরিণ ভেবে শ্রীকৃষ্ণের পদতলে বাণ নিক্ষেপ করলেন।

"কাছে এসে জরা তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি মধুসূদনের পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লেন।

"কৃষ্ণ তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। বললেন—ভবিতব্যকে খণ্ডন করবার ক্ষমতা কারও নেই।

"অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ নিজ কান্তি দ্বারা আকাশ আবৃত করে বৈকুণ্ঠ-লোকে মহাপ্রয়াণ করলেন। স্বর্গে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। এমন শুভদিন স্বর্গে আর কখনও আসে নি।"

"মর্ত্যেরও এমন দুর্দিন আর কখনও হয় নি। কারণ সেদিন থেকেই আরম্ভ হয়েছে কলিযুগ—ঘোরকলি।" সরকারদা থামতেই দাদা মন্তব্য করেন।

উমাদি বলেন, "শ্রীকৃষ্ণের দেহ কি সেখানেই পড়ে ছিল?"

"হ্যাঁ। মহাভারতের মতে অর্জুন প্রভাসে এসে কৃষ্ণ-বলরামের দেহ খুঁজে বের করে সৎকার করেছিলেন। তারপরে তিনি কৃষ্ণের ষোল হাজার পত্নী সহ দ্বারকার সমস্ত নারী বৃদ্ধ ও বালকদের নিয়ে দ্বারকা থেকে হস্তিনাপুরের পথে রওনা হয়েছিলেন। কৃষ্ণের প্রপৌত্র এবং একমাত্র বংশধর অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রনাভ তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। অর্জুন চলে যাবার পরেই সমুদ্র এগিয়ে এসে দ্বারকাকে গ্রাস করল। দ্বারকানাথের দ্বারকাও হারিয়ে গেল চিরকালের মতো।"

"কিন্তু আমরা যে শুনেছি শ্রীকৃষ্ণ স্বশরীরেই স্বর্গারোহণ করে-ছিলেন! এবং তাঁর এই অন্তর্ধান-লীলা দেবতারা পর্যন্ত দেখতে পান নি, কেবল তাঁর পার্ষদরা দেখেছিলেন!"

"ঠিকই শুনেছেন।" সরকারদা উমাদিকে বলেন, "ওটা শ্রীমদ্ভাগবদের মত। তবে ভাগবতেও বলা হয়েছে এই লীলাস্থল প্রভাস—'যত্র প্রত্যক্ সরস্বতী', যেখানে সরস্বতী পশ্চিম-প্রবাহিনী।

মহাভারতেও বলা হয়েছে সরস্বতী সঙ্গমে। আমরা এখন সেখানেই চলেছি।"

"আরেকটা কথা।" উমাদি সরকারদার দিকে তাকান।

"বেশ বলুন।"

উমাদি বলেন, "দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ' বইতে পড়েছি, বলভদ্র দেহরক্ষার পরে শ্রীকৃষ্ণ দারুককে আদেশ দিলেন — অনিরুদ্ধের ছেলে বজ্রনাভকে মথুরায় রেখে এসো। বজ্র কাছে আসার পরে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন — তুমি মেয়েদের মথুরা নিয়ে যাও। তাদের সেখানে রেখে হস্তিনায় গিয়ে অর্জুনকে খবর দাও। আজ থেকে সাতদিন পরে কার্তিকী পূর্ণিমায় দ্বারকা সমুদ্রে বিলীন হবে।"

"হ্যাঁ," সরকারদা বলেন, "ওটাও পুরাণের মত। মহাভারতে বলা হয়েছে — অর্জুন দ্বারকার নারীদের সঙ্গে বজ্রনাভকেও সঙ্গে নিয়ে যান। পথে পাঞ্জাবে কোন জায়গায় আভীর দস্যুরা রূপসী ও যুবতীদের হরণ করে নিয়ে যায়।

"সব্যসাচী তাঁদের রক্ষা করতে পারেন না। কারণ তিনি তাঁর সমস্ত অস্ত্রের নাম ভুলে গিয়েছিলেন, অবশিষ্ট নারীদের নিয়ে অর্জুন কুরুক্ষেত্রে পৌঁছন। কৃতবর্মার পুত্র ও ভোজ নারীদের মার্তিকাবত নগরে এবং সাত্যকির পুত্রকে সরস্বতী নদীর তীরে রেখে অন্যান্য নারী শিশু ও বজ্রনাভকে নিয়ে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলেন। তিনি বজ্রনাভকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজত্ব দান করলেন।

"কৃষ্ণ-পত্নী রুক্মিণী, জাম্ববতী, গান্ধারী, শৈব্যা ও হৈমবতী আগুনে আত্মাহুতি দিলেন। সত্যভামা এবং অন্যান্য কৃষ্ণপত্নীরা হিমালয় পেরিয়ে কলাপ গ্রামে গিয়ে কৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন হলেন।"

পাঁচ

বেলা এগারোটা নাগাদ ট্রেন জুনাগড় পৌছল। জুনাগড়ের জনপ্রিয় নাম সোরাঠ—সৌরাষ্ট্রের অপভ্রংশ। আমরা রাজকোট থেকে ১০৩ কিঃ মিঃ আর জীতলসর থেকে ২৫ কিলোমিটার এসেছি। এখান থেকে ভেরাভল ৮৩ কিলোমিটার। জুনাগড় শহরের আয়তন ৩৭৭০ একর। জনসংখ্যা প্রায় একলক্ষ, ভৌগোলিক অবস্থান ৭০°১৩′ পূর্ব-দ্রাঘিমা ও ২১°১′ উত্তর অক্ষরেখা।

ট্রেন মাত্র কয়েক মিনিট দাঁড়াবে এখানে। তাই তাড়াতাড়ি নেমে আসি গাড়ি থেকে। এই জনপদটিকে ঘিরে যে আমার অনেক স্মৃতি আছে জড়িয়ে। ভারত স্বাধীন হবার ঠিক পরেই জুনাগড় বেশ কয়েকদিন ধরে সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়েছিল। জুনাগড়ের নবাব রাজ্যের জনসাধারণ ও অবস্থানের কথা বিস্মৃত হয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে অমুসলমানদের নির্মূল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাঁর সেই খোয়াবকে হাসিল করতে দেন নি। জুনাগড়ের শাহান্‌শাহ্‌ শেষপর্যন্ত পাকিস্তানে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেছেন।

জুনাগড় ভারতের প্রাচীনতম জনপদগুলির অন্যতম। প্রাচীনত্বের গৌরবে গুজরাতে প্রভাসের পরেই জুনাগড়। আর সৌন্দর্যের বিচারে জুনাগড়ের স্থান সবার ওপরে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মেজর ওয়াটসন বলেছেন—'Junagdh is one of the most picturesque towns of India and in antiquity and historical interest it yeilds to none.'

সেই সৌন্দর্যের আকর গির্ণার পাহাড়টিকেই দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে। মাত্র মাইল দু'য়েক দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে। মহাকবি মাঘের মতে গির্ণার প্রতি পলে রূপ পালটায়।

শুধু মহারাজা কিংবা সুলতানরা নয়, যোগী ও ঋষিরাও যুগে যুগে গির্ণারকে তাঁদের তপোভূমিরূপে নির্বাচিত করেছেন। তাই গির্ণারের বুকে গড়ে উঠেছে মন্দির ও মঠ। সুন্দরী গির্ণার পরিণত হয়েছে পবিত্রতীর্থে।

সুদূর অতীত থেকেই গির্ণার হিন্দু ও জৈনদের কাছে তীর্থরূপে পরিচিত। গির্ণারই কৃষ্ণ ও বলরামের রৈবতক। প্রাচীন পুঁথিতে গির্ণারকে উজ্জয়ন্ত, ঊর্জয়ন্ত এবং গিরিনারায়ণ বলা হয়েছে। বর্তমান গির্ণার নামটি নিঃসন্দেহে গিরিনারায়ণ নামের অপভ্রংশ।

গির্ণারের পাঁচটি প্রধান শৃঙ্গের নাম অম্বাজী, গোরখনাথ, গুরু দত্তাত্রেয়, ওঘাধ এবং কালকা। গোরখনাথ সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, উচ্চতা ৩৬৬৬ ফুট।

সত্তর বর্গমাইল জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে গির্ণার। প্রায় পঁয়ষট্টিটি বিভিন্ন ধরণের গাছপালা রয়েছে এই বনময় পাহাড়ে। আগে এ পাহাড়ে প্রায়ই সিংহ দেখা যেত। এখনও গিরের জঙ্গল থেকে যে পথ ভুলে যে দু-একটি সিংহ এদিকে এসে না পড়ে, তা নয়। তবে তেমন ঘটনা আজকাল খুবই কম ঘটে।

শুনেছি গির্ণারের ওপর থেকে চারিপাশের বনভূমি ও আরব সাগরের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার জুনাগড়ে এসেও এবারে সেই স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শনের অবকাশ হল না আমার।

আমি জুনাগড়ে দাঁড়িয়ে আছি, এখান থেকে যাচ্ছি ভেরাভল, কিন্তু আমি যেতে পারব না গিরজঙ্গলে। দেখতে পারব না এশিয়ার সিংহদের সেই ১৭৭টি বংশধরকে। অথচ কাজটা মোটেই কঠিন নয়। জুনাগড়ের 'কনজারভেটর অব্ ফরেস্ট'কে বললে তিনি সেই পশুরাজদের সঙ্গে দেখা করার সব ব্যবস্থা করে দেন। জীপ, বাইনোকুলার এবং পথপ্রদর্শক সবই পাওয়া যায়।

রেলপথেও গিরজঙ্গলে যাওয়া যায়। দূরত্ব এখান থেকে ১২৭ কিঃমিঃ ও ভেরাভল থেকে মাত্র ৪৩ কিলোমিটার। স্টেশনের নাম সাসানগির—ছোট শহর। উচ্চতা ১৫৭'৪১ মিটার (৫১৬ ফুট)।

শহরের উপকণ্ঠে ১৫১৫ বর্গ কিলোমিটার (৫৮৫ বর্গমাইল) বনভূমি নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে পশুরাজদের সেই সংরক্ষিত বনাঞ্চল। সিংহ দর্শনের সবচেয়ে ভাল সময় এখন—এই মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত। কারণ এখন তারা নিয়মিত জলের কাছে আসে। অথচ আমরা যেতে পারব না গিরজঙ্গলে। আজ রাতেই ফিরতে হবে ভেরাভল থেকে।

শুধু সিংহ নয়, গিরজঙ্গলে গেলে দেখা হত গুজরাতের আদি-অধিবাসীদের সঙ্গে। সাসানগির থেকে বনের পথে শেষ গ্রাম শ্রীবন। সেখানে সেই কালো আদিবাসীদের কয়েকঘর অর্ধসভ্য মানুষ, পশু ও প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে কোনমতে আজও টিকে রয়েছে।

কিন্তু গির ফরেস্ট তো বহুদূর, তার চেয়ে যতক্ষণ পারি গির্ণারকে দেখে নিই। ভক্তরা নিয়মিত এই পবিত্র পাহাড় পরিক্রমা করেন। রাসপূর্ণিমায় বেশ বড় মেলা বসে গির্ণারে। জৈনদের কাছে পরেশনাথের পরেই গির্ণারের স্থান। শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক দ্বাবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর নেমীনাথের উদ্দেশ্যে তাঁরা এই পাহাড়টিকে উৎসর্গ করেছেন। পাহাড়ের ওপরে জৈনমন্দিরটিকেও দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

পদযাত্রীরা সাধারণতঃ ভোরে যাত্রা করেন। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে জৈনমন্দিরে পৌঁছতে হাজার চারেক সিঁড়ি ভাঙতে হয়। পথে পড়ে সীতাবন, ভরতবন, হনুমানধারা, গোমুখীকুণ্ড, কালীমন্দির ও গোরক্ষনাথের মন্দির প্রভৃতি। আর স্টেশন থেকে পাহাড়ে যাবার পথে নাকি সম্রাট অশোকের কিছু কীর্তি আজও দর্শন করা যায়। অর্থাৎ হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মিলনভূমি এই জুনাগড়।

বাঁশির শব্দে চমকে উঠি। কৃষ্ণের নয়, গার্ডের বাঁশি। গার্ড-সাহেব বাঁশি বাজিয়ে সবুজ নিশান ওড়াচ্ছেন। ট্রেন ছাড়ছে। তাড়াতাড়ি উঠে আসি গাড়িতে।

এসে দেখি সহযাত্রীরা সরকারদাকে ঘেরাও করেছেন। তাঁদের দাবী অর্জুনের সুভদ্রা-হরণের কাহিনী বলতে হবে। কারণ সেই

'ইলোপ্'-য়ের অকুস্থল রৈবতক। তার মানে সদ্য দেখা গির্ণার।

সরকারদা বলছেন, "কিন্তু সে কাহিনী তো সেদিন বললাম আপনাদের, আবু-রোড থেকে দ্বারকা যাবার পথে।"

"ভুলে গিয়েছি।" দাদা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন।

সত্যেনদা দাবী করেন, "আরেকবার বলুন।"

আপত্তি করে কোন লাভ হবে না বুঝতে পেরেই বোধহয় মৃদু হেসে সরকারদা শুরু করেন, "সেদিন আমি আপনাদের বলেছি, দ্রৌপদীকে বিয়ে করার পরে পঞ্চ-পাণ্ডবদের মধ্যে একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হয়েছিল যে তাঁদের একজন যখন দ্রৌপদীর কাছে থাকবেন, তখন আর কেউ সে ঘরে যেতে পারবেন না। যিনি এই চুক্তি লঙ্ঘন করবেন, তিনি বারো বছরের জন্য বনবাসী হবেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ যুধিষ্ঠির একদিন যখন আয়ুধাগারে দ্রৌপদীর সঙ্গে সহবাস করছিলেন, তখন একজন ব্রাহ্মণ অর্জুনের কাছে এসে বললেন — একটা চোর আমার গোধন চুরি করে পালাচ্ছে। এখুনি তাকে না রুখলে, সে পালিয়ে যাবে।

"বাধ্য হয়ে অর্জুনকে অস্ত্রের জন্য আয়ুধাগারে প্রবেশ করতে হল। কিছুক্ষণ বাদেই গোধন উদ্ধার করে অর্জুন ফিরে এলেন প্রাসাদে। কুন্তীদেবী দ্রৌপদী ও ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বারো বছরের জন্য বনবাসী হলেন তিনি।

"এই বনবাসের সময় অর্জুন প্রায় সারা ভারত ভ্রমণ করেন। তখুনি তিনি নাগকন্যা উলুপী ও মণিপুর রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করেছেন। তিনি তিন বছর মণিপুরে বাস করেন। বীরপুত্র বভ্রুবাহনের জন্ম হয়। মণিপুর থেকে বিভিন্ন তীর্থদর্শনের পরে অর্জুন প্রভাসে পৌছলেন।

"খবর পেয়ে দ্বারকা থেকে কৃষ্ণ ছুটে এলেন প্রভাসতীর্থে। কৃষ্ণ অর্জুনকে নিয়ে এলেন এখানে — এই রৈবতক পর্বতে। কারণ রৈবতক ছিল কৃষ্ণ-বলরামের প্রিয়তম বিহারভূমি। স্ত্রী রেবতীর নাম থেকেই নাকি বলরাম এই পাহাড়ের নাম রেখেছিলেন রৈবতকগিরি।

"কৃষ্ণ রৈবতক থেকে অর্জুনকে দ্বারকায় নিয়ে গেলেন। দ্বারকা-বাসীরা বিপুল সংবর্ধনা জানালেন অর্জুনকে। কয়েকদিন সেখানে কাটিয়ে অর্জুন আবার এলেন রৈবতকে। তখন এখানে যাদবদের এক মহোৎসব হচ্ছিল। কৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুন যখন সেই মহামেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন তিনি সখীদের সঙ্গে সুন্দরী সুভদ্রাকে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সব্যসাচীর চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠল।

"অন্তর্যামী কৃষ্ণ অর্জুনের মনোস্কামনা বুঝতে পেরে সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন — সখা! বনবাসী হয়েও মদনবাণে চঞ্চল হলে? অবশ্য চিন্তার কিছু নেই, মেয়েটি আমার পিতার পালিতা কন্যা, নাম সুভদ্রা। নিতান্তই যদি ওর প্রতি অনুরক্ত হয়ে থাকো, তাহলে বল। বাবাকে বলি কথাটা।

" — কিন্তু তিনি কি মত দেবেন? অর্জুন প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণকে। — শুনেছি দাউজী (বলরাম) তোমার এই বোনটিকে তাঁর প্রিয়শিষ্য দুর্যোধনের হাতে সম্প্রদান করতে চান।

"কথাটা কৃষ্ণের অজানা ছিল না। এবং প্রস্তাবটা তাঁর পছন্দসই নয় বলেই তিনি অর্জুনকে বললেন — সে-সব ভাবনা আমার. তোমার কি ইচ্ছে তাই বল।

" — অনিচ্ছা হবে কেন বল? একে তোমার বোন, তার ওপরে এমন স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী। যদি তোমার অনিচ্ছা না থাকে, তাহলে বল, কিভাবে আমি সুভদ্রাকে পেতে পারি?

"বাসুদেব বললেন — স্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়দের বিধেয়, কিন্তু মেয়েদের মনকে বিশ্বেস নেই। শাস্ত্রকরগণ বলেন, বিয়ের জন্য নারীহরণ বীর ক্ষত্রিয়দের প্রশংসনীয় কাজ। অতএব তুমি আমার বোনকে হরণ কর।

"অর্জুন তখন দূত মারফৎ যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে সুভদ্রা-হরণের অনুমোদন নিয়ে এলেন। তারপরে শ্রীকৃষ্ণের শুভেচ্ছা নিয়ে সশস্ত্র অর্জুন রৈবতকের দেবালয়ে উপস্থিত হলেন। সুভদ্রা তখন দেবার্চনা শেষ করে দ্বারকা ফিরে যাবার জন্য রথে উঠেছেন। মদনবাণে

আহত সব্যসাচী সহসা এগিয়ে এসে সুন্দরী সুভদ্রার পাণিপীড়ন করলেন। সুভদ্রার দেহরক্ষীরা অস্ত্র বের করার আগেই অর্জুন তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। ত্বরিত পদক্ষেপে ফিরে এলেন নিজের রথে। সব্যসাচী ও সুভদ্রাকে নিয়ে বিদ্যুৎবেগে রথ চলল ইন্দ্রপ্রস্থের পথে।

"সুভদ্রার দেহরক্ষীরা অর্জুনকে আক্রমণ করতে সাহসী হলেন না। তাঁরা দ্বারকায় এসে অর্জুনের সুভদ্রা-হরণের সংবাদ দিলেন। ভোজ বৃষ্ণি ও অন্ধক অর্থাৎ সমস্ত যাদবরাই অকৃতজ্ঞ অর্জুনের ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। সবচেয়ে রেগে গেলেন বলরাম। তিনি ছুটে এলেন কৃষ্ণের কাছে। বললেন — তোমার সাকরেদ অর্জুনের কীর্তি শুনেছো। ছি, ছি! তোমার অনুরোধে আমরা যাকে আতিথ্য দান করেছি, সেই কুলপাংশুল এই কাজ করল! সে যে থালায় খেয়েছে, সেই থালা ছিঁদে করেছে।

"কিছুই যেন জানেন না এমনি ভাব মুখে ফুটিয়ে কৃষ্ণ পাল্টা প্রশ্ন করলেন — কেন। কি করেছে অর্জুন?

"—কি না করেছে সে? সে সমস্ত যদুবংশকে দুঃসহ অপমান করেছে। আমাদের প্রাণাধিক সুভদ্রাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

"— তাই বল। কৃষ্ণ যেন এতক্ষণে বুঝতে পারেন ব্যাপারটা। তিনি কৃত্রিম স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন — কিন্তু সুভদ্রাকে নিয়ে গিয়ে অর্জুন তো যদুবংশকে অপমান করে নি।

"— করে নি?

"— না। সে আমাদের বংশের সম্মান বৃদ্ধি করেছে।

"— কিভাবে?

"— প্রথমতঃ সে আমাদের অর্থলোভী মনে করে সুভদ্রার জন্য কনেপণ দেবার প্রস্তাব করে নি। দ্বিতীয়তঃ স্বয়ংবর সভার আয়োজন করার হাঙ্গামা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। তৃতীয়তঃ বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়ে অক্ষত্রিয়ের মতো কাজ করে নি।

"— তা সে আমাদের বংশের সম্মান বৃদ্ধি করল কেমন করে?

"—কুল-শীল বিদ্যা-বুদ্ধি ও বীরত্বে ধনঞ্জয় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পাত্র। সে সুভদ্রাকে গ্রহণ করায় যদুবংশের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে বৈকি! কারণ এতে সুভদ্রা যশস্বিনী হবে। তার পুত্র-প্রপৌত্র যে ভবিষ্যৎ ভারতের রাজসিংহাসন পাবে।

"বলরাম আর কোন প্রশ্ন করতে পারেন না। তিনি চুপ করে থাকেন। তাঁকে নীরব দেখে কৃষ্ণ অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠেন —তাছাড়া কুন্তীভোজের দৌহিত্র মহাবীর অর্জুনকে তোমরা কিই-বা করতে পারো? মহাদেব ছাড়া আর কে তাকে পরাজিত করতে পারে? কাজেই তার সঙ্গে আত্মনাশী সংগ্রামে লিপ্ত না হয়ে, প্রফুল্ল মনে এখন তাকে আমাদের অভিনন্দন করা উচিত।

"বলাবাহুল্য বলরাম এবং অন্যান্য যাদবগণ পার্থসারথির পরামর্শ মেনে নিলেন। তাঁরা সব্যসাচী ও সুভদ্রাকে সসম্মানে দ্বারকায় নিয়ে এলেন। মহাসমারোহে তাঁদের শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হল।"

সরকারদা চুপ করেন। আর ঠিক তখুনি কানে আসে, "হেয়াতে আপনাগো কি? আমাগো জল ছাড়া চলে না। আমরা আপনাগো মতন এ্যাক ঘড়ি জলে ছয়খান কাপড় ধুইতে পারি না।"

পাঁচু আমার দিকে তাকায়। বলি, "মনে হচ্ছে, ছোটঠাকুরমা চীৎকার করছেন।"

পাঁচু মাথা নাড়ে। বলে, "চলুন তো, দেখে আসি একবার।"

তাড়াতাড়ি ঠাকুরমাদের খোপে আসি। দেখি অমিয়বাবু দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রলোক ভয়ে প্রায় কম্পমান।

আমাদের, বিশেষ করে ম্যানেজারকে দেখতে পেয়ে ছোটঠাকুরমার জোর যেন বেড়ে গেল। গলার স্বর আরও চড়িয়ে তিনি পাঁচুকে প্রশ্ন করলেন, "আপনেই কয়েন ম্যানেজারবাবু! আমরা কি আপনার গাড়ির জল নষ্ট করি?"

"না, না। আপনারা তো স্টেশনের জল দিয়েই স্নান ও কাচার কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন।"

"তাইলে। উনি আমাগো কাপড় কাচা লইয়া খোঁটা গ্যান

ক্যান ?" বড়ঠাকুরমা অমিয়বাবুকে দেখিয়ে দিলেন।

অমিয়বাবু কি বলেছেন না জেনেই তাড়াতাড়ি বলে উঠি, "না, না, এ অমিয়বাবুর অন্যায়, খুবই অন্যায়। না মশাই, কাপড় কাচা নিয়ে ঠাকুরমাদের খোঁটা দেওয়া উচিত হয় নি আপনার। এবারে চলুন, জায়গায় গিয়ে বসবেন।" অমিয়বাবুকে কোন জবাব দেবার সুযোগ না দিয়েই তাঁকে একরকম টানতে টানতে নিয়ে চলি নিজের জায়গায়।

বেচারী অমিয়বাবু কেবলি বলতে থাকেন, "ঘোষদা! সত্যি বলছি, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি ওঁদের খোঁটা দিই নি। শুধু বলেছি—আপনাদের মতো কাচাকাচি করতে পারলে, আমাকেও এমন ময়লা জামা-কাপড় পরে ঘুরে বেড়াতে হত না।"

"কিন্তু একথাটা কি এতই মূল্যবান যে না বললে চলত না।"

"না, মানে···"

"মানে আর কখনও এ ধরনের কথা বলবেন না ওঁদের।"

অমিয়বাবু মাথা নাড়েন। পাঁচুবাবুও সহাস্য মুখে ফিরে আসে একটু বাদে। অনুমান করতে পারছি। সে তার বৃদ্ধা যাত্রীদের শান্ত করতে সমর্থ হয়েছে।

জায়গায় এসে দেখি বিউটি বসে আছে। সে তার দাদু অর্থাৎ আমার দাদার সঙ্গে গল্প করছে। সহযাত্রীরা অনেকেই ·লেন কর্তা-গিন্নী যেমন মিল তেমনি অমিল।

আমি আসতেই বিউটি কিন্তু দাদুর সঙ্গে কথা বন্ধ করে আমাকে বলে বসল, "মামু! আমরা প্রভাস ও সোমনাথে যাচ্ছি কিন্তু সেখানকার কথা যে কিছুই জানি না।"

"কেন সরকারদার কাছে তো আজ শুনলে সুভদ্রা-হরণ ও মৌষলপর্বের কথা। তাছাড়া সেদিন তিনি বনবাসের সময় পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর প্রভাস দর্শনের কথাও বলেছেন।"

"আচ্ছা সেই ঘটনাটি যেন কি ?" দাদা মাঝখান থেকে প্রশ্ন করে বসলেন।

"আমিও ভুলে গিয়েছি ভাই, বল না একবার।" সত্যেনদা যোগ করে।

হেসে বলি, "তোমরা ভুলে গিয়েছ আর আমার মনে আছে এ ধারণার কারণ?"

"নিশ্চয়ই কিছু আছে।" সত্যেনদা উত্তর দেয়। বলে, "যাক্ গে, এবার সংক্ষেপে পাণ্ডবদের প্রভাস দর্শনের কাহিনীটা বলে ফেল তো ভাই!"

সুতরাং শুরু করতে হয় আমাকে, "পাণ্ডবদের বনবাসের সময় দিব্যাস্ত্রলাভের জন্য অর্জুন তপস্যা করতে চলে গেলেন। তাঁর ভাইরা খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। তাঁরা কাম্যবন ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবেন ঠিক করলেন। এই সময় দেবর্ষি নারদ সহসা সেখানে উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে তিনি তীর্থপর্যটনের সুফল সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ ভাষণ দান করলেন। বহুশত তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে নারদ যুধিষ্ঠিরকে বললেন — নিয়ম মেনে তীর্থ দর্শন করলে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের চেয়েও বেশি পুণ্যার্জন করা যায়। স্থানীয় ঋষিরা অপেক্ষা করছেন, লোমশ মুনিও আসছেন, তোমরা তাঁদের সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়।

"নারদের পরামর্শে যুধিষ্ঠির তিন ভাই ও দ্রৌপদীকে নিয়ে লোমশ মুনির সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বের হলেন। তাঁরা নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ ও পুরী হয়ে গঙ্গাসাগরে গেলেন। তারপরে কলিঙ্গ ও দ্রাবিড়দেশ দর্শন করে অগস্ত্য ও সুর্পারক প্রভৃতি তীর্থ দেখে প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হলেন।

"তাঁদের প্রভাসে আসার খবর পেয়ে বলরাম ও কৃষ্ণ সসৈন্যে সেখানে ছুটে এলেন। দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদের শীর্ণদেহ ও জীর্ণ পোষাক দেখে যাদবরা খুবই কষ্ট পেলেন।

"বলরাম বললেন — ধর্মাচরণ করলেই মঙ্গল হয় আর অধর্ম করলেই অমঙ্গল হয়, কথাটা সত্য নয়। নইলে যেখানে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এত কষ্ট পাচ্ছেন, সেখানে অধার্মিক দুর্যোধন রাজত্ব

করছে! এ দেখে যদি কেউ ধর্মের চেয়ে অধর্মকে ভাল বলে, তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যাবে না। আশ্চর্য! পাণ্ডবদের বনে পাঠিয়ে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ও ধৃতরাষ্ট্র কি সুখ পাচ্ছেন জানি না। তবে তাদের ধিক্! আর পাণ্ডবদের এই কষ্ট এবং দুর্যোধনের সুখ দেখে মা-বসুন্ধরা যে কেন বিদীর্ণ হচ্ছেন না, তাও আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

"সাত্যকি ছিলেন যেমন বীর, তেমনি রাগী। বলরাম থামতেই তিনি বলে উঠলেন—বিলাপ করে লাভ নেই কিছু। যুধিষ্ঠির অনুমোদন না করলেও আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করব। এসো, আজই যুদ্ধযাত্রা করা যাক্। আমরা দুর্যোধনকে হত্যা করে রাজ্য উদ্ধার করব। যুধিষ্ঠির যদি একান্তই প্রতিজ্ঞা পালন করতে চান, করুন। আপাতত অভিমন্যু রাজ্য শাসন করুক। বনবাসের মেয়াদ শেষ হলে যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসবেন।

"কৃষ্ণ কিন্তু এ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারলেন না। তিনি বললেন—যুধিষ্ঠিরকে আমি যতটা জানি, তাতে আমার স্থির বিশ্বাস, অন্যের বিজিত রাজ্য তিনি কিছুতেই গ্রহণ করবেন না। তাছাড়া তাঁর ভাইরা, এমনকি দ্রৌপদীও স্বধর্ম ত্যাগ করবে বলে আমার মনে হয় না।

"এবারে কথা বললেন যুধিষ্ঠির। বললেন—একমাত্র কৃষ্ণই আমাকে জানে। রাজ্যের চেয়েও আমার কাছে সত্য বড়। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, প্রয়োজন হলে কৃষ্ণই আপনাদের যুদ্ধ করতে বলবে। তখন আপনারা দুর্যোধনকে পরাজিত করে আমাকে সিংহাসন দিতে চান, দেবেন। আমি সানন্দচিত্তে সে সিংহাসন গ্রহণ করব।

"অবশেষে দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম ও অন্যান্য যাদবরা দ্বারকায় ফিরে চললেন। আর পাণ্ডবরা প্রভাস থেকে রওনা হলেন বৈদূর্য পর্বতের দিকে।"

বিউটি এতক্ষণ চুপ করে শুনেছে। এবারে কথা বলে, "এতো আপনি সবই সেকালের কথা বললেন মামু! আমি একালের কথা শুনতে চাইছি।"

আমি কোন উত্তর দিতে পারার আগেই ম্যানেজার স্থপারিশ করে, "প্রস্তাবটা মন্দ নয় ঘোষদা! ভেরাভল পৌঁছতে এখনও প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাকী। এর মধ্যে আপনি প্রভাস ও সোমনাথের একটা মোটামুটি পরিচয় দিতে পারবেন।"

আমি ম্যানেজারের দিকে তাকাই। সে মৃদু হেসে আবার বলে, "বিউটি ঠিক মানুষটিকেই ধরেছে। আপনি অনায়াসে তাঁর কৌতূহল মেটাতে পারেন।"

শঙ্কিত হয়ে উঠি। ম্যানেজার আমার প্রকৃত পরিচয় জানে। সে যেমন কাজের মানুষ, তেমনি চালাক চতুর। আমার ডায়েরী লেখা, ছবি তোলা এবং সর্বোপরি আমার কাছে শঙ্কু মহারাজের বই দেখে, সে গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিল। তাই স্থযোগ পেয়ে দ্বারকায় রণছোড়জীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে কথাটা স্বীকার করিয়ে নিয়েছে আমাকে দিয়ে। অবশ্য সে-ও প্রতিজ্ঞা করেছে, আমার প্রকৃত পরিচয় সহযাত্রীদের কাছে প্রকাশ করবে না।

তাহলেও আর কথা না বাড়িয়ে বলতে শুরু করি, "প্রভাস ভারতের প্রাচীনতম নগরীগুলির অন্যতম। সৌরাষ্ট্রের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত এই জনপদ এখন গুজরাতের জুনাগড় জেলার অন্তর্গত। ২০°:১৫´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৭০°২৪´ পূর্ব-দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই বন্দর-নগরীর আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ এবং স্বাস্থ্যকর। ১৯৭১ সালের আদমস্থমারি অনুযায়ী বর্তমান প্রভাস তথা পাটন শহরের আয়তন ৩১·৮৬ বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা ১৬, ৭৪৯ জন। তাঁদের মধ্যে নারীর সংখ্যা ৮, ১৯৭ আর পুরুষ ৮, ৫৫২ জন। তাঁরা ২, ৮০১ টি বাড়িতে ২, ৮৪১ টি পরিবারে বিভক্ত।"

"আচ্ছা মামু! এই ট্রেন তো আমাদের ভেরাভল নিয়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে প্রভাস কতদূর?"

"আট কিলোমিটারের মতো।"

"স্টেশন থেকে আমাদের বোধহয় টাঙ্গা করতে হবে?"

"হ্যাঁ।" ম্যানেজার মাথা নাড়ে।

আমি বলি, "তুমি যখন ভেরাভলের কথা তুললে, তখন ভেরাভল থেকেই বলতে শুরু করছি।"

"হ্যাঁ। তাই ভাল।" বিউটি বেণী দুলিয়ে মাথা নাড়ে।

আমি বলতে থাকি, "ভেরাভলের কোন প্রাচীন ঐতিহ্য নেই দ্বারকা প্রভাস কিংবা সোমনাথের মতো। কিছুকাল আগেও সে ছিল একটি অনুন্নত গ্রাম। কিন্তু সমুদ্রের গভীরতা এবং অবস্থানের জন্য ভেরাভল আজ পশ্চিম ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর।

"মাছ রপ্তানীর জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত। উপকূলবাহী জাহাজ তৈরির একটি কারখানা সহ সেখানে এখন বহু কল-কারখানা আছে। পর্যটকদের জন্য ভেরাভলে রয়েছে রাজেন্দ্রভবন গেস্ট হাউস এবং নির্মাণ বিভাগের ডাকবাংলো। ১৯৭১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ভেরাভল শহরের জনসংখ্যা ৫৮,৭৭১ জন। তাঁদের মধ্যে নর ও নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩০,২০৬ এবং ২৮,৫৬৫ জন। তাঁরা ৯,৮২৪ টি পরিবারে ৯,৪৬৬ টি বাড়িতে বাস করছেন।

"ভেরাভলের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রভাস পেছিয়ে পড়েছে। অথচ কিছুকাল আগেও প্রভাসই ছিল স্থানীয় তালুকের সদর। এখন ভেরাভল শুধু প্রভাসের স্থান নেয় নি, সেই সঙ্গে সেখানে গঠিত হয়েছে পৌরসভা। আর প্রভাস প্রায় একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে।"

"গ্রাম!" বিউটি যেন চমকে ওঠে।

"হ্যাঁ, মা! কৃষ্ণ-বলরামের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত পুণ্যতীর্থ-প্রভাস এখন প্রায় একটি গ্রাম। সেকালে প্রভাস ছিল সুবিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে, আর একালে তার আয়তন মাত্র ৫৮·২ বর্গ কিলোমিটার, তাও জনবিরল।"

"শুনেছি সেখানে দ্বাদশ শতাব্দীর একটি ভগ্ন দুর্গ আছে?" দাদা প্রশ্ন করেন এবারে।

ম্যানেজার জবাব দেয়, "হ্যাঁ। সেই দুর্গপ্রাকার থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগই এখন কেবল প্রভাস নামে পরিচিত।"

"আচ্ছা মামু! প্রভাসের এই পতনের কারণ কি?"

"নিঃসন্দেহে মুসলমান আক্রমণ। তুমি জানো যে ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সুলতান আমীর মাহ্‌মুদের সেই আক্রমণ থেকে আরম্ভ করে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের আক্রমণ পর্যন্ত প্রভাস প্রায় প্রত্যেক যুগে ধর্মান্ধতার শিকার হয়েছে।"

"কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই তো এ অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাহলে প্রভাস আজও এমন অনুন্নত কেন?"

"ব্রিটিশরা প্রভাসের চেয়ে ভেরাভলের দিকেই বেশি নজর দিয়েছিলেন, কারণ ব্যবসায়ীর বিচারে ভেরাভলের অবস্থান তাঁদের কাছে সুবিধাজনক বলে মনে হয়েছে। হয়তো সেই কারণেই ১৯০৮ সালে প্রকাশিত ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে প্রভাসের উল্লেখ থাকলেও বলা হয়েছে — 'a gloomy place, a city of graves and ruins."

"তাই বলুন।" বিউটি আবার সবেগে মাথা নাড়ে। এবারে বেণীর সঙ্গে তার কানের ঝুম্‌কো দুটিও দুলে ওঠে। আমার মনে পড়ে শ্রীর কথা। তারও কানে অমনি দুটি দুল আছে। মাথা নাড়লে সে-দুটিও দুলে ওঠে।

বিউটি আমাকে মামু ডাকছে। এই ডাকটি শ্রীর। কলকাতা থেকে দিল্লী আসার পথে প্রথম পরিচয়ের পরে সে-ই প্রথম আমাকে মামু বলে ডাক দিয়েছিল।

জানি না সে এখন কোথায়, কিভাবে আছে? কেমন আছে? তাকে আবু-রোডে ফেলে রেখে আমি স্বার্থপরের মতো তীর্থ-দর্শন করে চলেছি।

আমার নীরবতা বোধহয় সহ্য হয় না বিউটির। সে বলে ওঠে, "ওকি! চুপ করে আছেন কেন? বলুন না প্রভাসের কথা।"

বাধ্য হয়ে আবার শুরু করতে হয়, "পুরাকালে প্রভাসের নাম ছিল নাগরাপুর। নাগরাদিত্য-সূর্যমন্দির কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল এই জনপদ। আজও সে মন্দির রয়েছে আর সেখানেই খনন করে প্রাক-বৈদিকযুগের কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

"অনার্য আমল থেকেই প্রভাস একটি প্রখ্যাত বন্দর — ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি প্রধান কর্মকেন্দ্র। তখন প্রভাস-বন্দর থেকে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল ও অন্যান্য আরব দেশের বিভিন্ন বন্দরে নিয়মিত জাহাজ যাতায়াত করত।

"প্রাক-আর্যযুগে প্রভাসের নাম ছিল 'মিনুর'। দ্রাবিড় ভাষায় এই শব্দটির অর্থ অত্যুজ্জ্বল! পরবর্তীকালে আর্যরা বোধকরি নূতন নাম রাখার সময়ে এই নামটিকে মনে করে থাকবেন। কারণ সংস্কৃত 'প্রভাস' শব্দের অর্থও অত্যুজ্জ্বল।

"এই নামকরণের একটা বিজ্ঞানসম্মত কারণও রয়েছে। প্রভাস সমুদ্রসৈকতের এমন একটি স্থানে অবস্থিত, যেটি সূর্যকিরণে ও চন্দ্রালোকে চারিপাশের সমস্ত জায়গা থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে।

"সূর্যবংশীয় আর্যরাই প্রথম প্রভাসে আসেন। তাঁরা সম্ভবতঃ প্রভাস-সৈকতে অবতরণ করেন। স্থানীয় অনার্যদের ওপরে তাঁরা সহজেই নিজেদের অধিকার কায়েম করলেন। তাঁরা প্রভাসের নাম রাখলেন — ভাস্করতীর্থ বা অর্কতীর্থ।

"সূর্যবংশীয়দের পরে চন্দ্রবংশীয় আর্যরা প্রভাসে এলেন। তাঁরা এই রমণীয় স্থানের নাম রাখলেন সোমতীর্থ। নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা সূর্যবংশীয়দের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। সংঘর্ষ চলল বেশ কিছুকাল ধরে কিন্তু জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হল না। ফলে সন্ধি হল। ক্রমে ক্রমে তাঁদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হতে থাকল। তাঁরা মিলিত হলেন। সেই মিলনের প্রতীক স্বরূপ তাঁরা এই মনোরম নিকেতনের নতুন নাম রাখলেন প্রভাস — পুণ্যতীর্থ-প্রভাস।

"মহাভারত রচিত হবার অনেক আগেই প্রভাস পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়েছিল। বৈদিকযুগে সর্বজ্ঞ ঋষিরা প্রভাসে এসে যাগ-যজ্ঞ করতেন এবং শিষ্যদের বেদশিক্ষা দিতেন। তাঁদের যজ্ঞের হোমাগ্নি শিখায় প্রভাসের আকাশ-বাতাস ব্যাপ্ত হত! সরস্বতী হিরণ্য ও কপিলা প্রভৃতি স্রোতস্বিনীর পুণ্যপ্রবাহে প্রভাস প্রতিনিয়ত বিধৌত

হত। প্রভাস তখন সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা। সর্বদা ফুল-ফল দুধ ও মধুতে মনোহর। তাই পাণ্ডবরা তীর্থদর্শনে বেরিয়ে প্রভাসে এসেছিলেন আর শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসকেই তাঁর প্রয়াণতীর্থ রূপে নির্বাচিত করেছিলেন।

"স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে, এখানে অবগাহন ও সোমনাথের তপস্যা করে চন্দ্র তাঁর হারানো দীপ্তি ফিরে পেয়েছিলেন বলে এই পুণ্যতীর্থের নাম হয়েছে প্রভাস।..."

"গল্পটা একটু বলুন না ঘোষদা!" কল্পনাদি বাধা দিলেন আমাকে।

বলি, "চন্দ্র ও রোহিণীর কাহিনী পরে হবে। এখন যেকথা বলছিলাম, তাই শুনুন।"

মনে মনে হয়তো একটু ক্ষুণ্ণ হলেন কল্পনাদি, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করেন না। তিনি চুপ করে থাকেন।

আমি আবার শুরু করি, "স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে বলা হয়েছে, প্রভাস নামে পরিচিত হবার আগে এই পুণ্যতীর্থ বিভিন্ন কল্পে বিভিন্ন বিভিন্ন নামে অবহিত হয়েছে যেমন—প্রমোদ, নন্দন, শিব, উগ্র, ভদ্রীক, বৈশ্বরূপ, মোক্ষমার্গ ও সুদর্শন প্রভৃতি। স্কন্দপুরাণে আরও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে পরবর্তীকালে প্রভাসের নাম হবে উৎপলা-বর্ত। বলা বাহুল্য সে ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয় নি। আর স্কন্দপুরাণ ছাড়া অন্য কোথাও এসব নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। মহাভারতে অবশ্য ভাস্করতীর্থ, অর্কতীর্থ, সোমতীর্থ, হিরণ্যসার ও আনর্তসার নাম কয়টির উল্লেখ পাওয়া যায়। আর প্রাচীন জৈনগ্রন্থে প্রভাসকে বলা হয়েছে চন্দ্র-প্রভাস। এছাড়া প্রভাসে প্রাপ্ত বিভিন্ন শিলালিপিতেও বিভিন্ন নামের উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে। যেমন—১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শিলালিপিতে লেখা আছে সোমপুর, ১২১৯ খ্রীষ্টাব্দের শিলালিপিতে হরনগর ও শিবনগর। ১২৬৪, ১২৭২ ও ১৩৮১ খ্রীষ্টাব্দের শিলালিপিতে যথাক্রমে ভিলভিলপুর পাট্টন, সুরপাট্টন ও সোমনাথপুর। আর স্থানীয়দের কাছে প্রভাসের প্রাচীন জনপ্রিয় নাম হল—সোরাঠী

সোমনাথ পাট্টন, ভেরাভল পাট্টন, প্রাচী পাট্টন ও প্রাচীন পাট্টন।”

“এযে শ্রীকৃষ্ণের মতো প্রভাসেরও অষ্টোত্তর শতনাম হয়ে গেল রে ভাই!” আমি থামতেই সত্যেনদা সহাস্যে মন্তব্য করেন।

“তা বলতে পারো। তবে এখনও সব নাম বলা হয় নি আমার।”

“দোহাই তোমার আর নামের দরকার নেই ভাই! যা বলেছো, তাতেই আমাদের দিব্যি চলে যাবে। এবারে প্রভাসের অন্য কথা বলো।” এবার দাদা মুখ খোলেন। তাঁর বাচনভঙ্গী সহযাত্রীদের হাসির উদ্রেক করে।

আমি আবার শুরু করি, “মহাভারতে বনপর্বের ৮১ অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ পাণ্ডবদের কাছে প্রভাসের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন — প্রভাস সর্বোত্তম তীর্থ। সেখানে দেবতাদের মুখস্বরূপ অনিলসারথি ভগবান হুতাশন সর্বদা সন্নিহিত আছেন। প্রভাসে স্নান করলে মানুষ অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রির ফললাভ করে, সরস্বতী-সাগরসঙ্গম দর্শন করলে সহস্র গোদানের ফলভাগী হয়। সে অগ্নির মতো দীপ্তিশালী হয়ে স্বর্গলোকে গমন করতে পারে। প্রভাসে স্নান তর্পণ ও তিনরাত বাস করলে মানুষ চন্দ্রের মতো প্রভাবশালী হয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করে।

“শুধু মহাভারত কিংবা স্কন্দপুরাণ নয়, ঋগ্বেদ যজুর্বেদ ও জ্ঞান-সংহিতা এবং অন্যান্য পুরাণেও প্রভাসের পুণ্যকীর্তন করা হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রচিত ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ পরিশিষ্টে সোমনাথ ও সরস্বতী নদীর উল্লেখ আছে। জ্ঞানসংহিতায় বলা হয়েছে, শিবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে সোমনাথই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থে দক্ষের অভিশাপ ও চন্দ্রের শাপমুক্তির কাহিনী রয়েছে।”

“এ কাহিনী তো মহাভারতেও আছে?” দাদা প্রশ্ন করেন।

উত্তর দিই, “হ্যাঁ। মহাভারতে শল্যপর্বের ৩৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে ভগবান তারাপতি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হবার পরে প্রভাসে

স্নান করে রোগমুক্ত হয়েছিলেন, তাই প্রভাস বলরামের বড়ই প্রিয় ছিল।"

"আচ্ছা, স্কন্দপুরাণ ছাড়া অন্য কোন্ কোন্ পুরাণে প্রভাসের উল্লেখ আছে?"

"শুধু উল্লেখ নয়। বামনপুরাণ পদ্মপুরাণ কূর্মপুরাণ গরুড়পুরাণ ভবিষ্যপুরাণ মৎস্যপুরাণ বিষ্ণুপুরাণ দেবীভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রভাসকে সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ বলা হয়েছে। তবে এই সব পুরাণে প্রভাসের বিবরণ স্কন্দপুরাণের মতো বিশদ নয়। আপনারা জানেন যে প্রভাসের ওপরে স্কন্দপুরাণের একটি পৃথক খণ্ড রয়েছে।......"

"হ্যাঁ, প্রভাসখণ্ড।" দাদা বলে ওঠেন।

"এই প্রভাসখণ্ডটি সম্ভবত খ্রীষ্টীয় সপ্তম কিংবা অষ্টম শতাব্দীতে বিরচিত। এই পুরাণে আমরা তৎকালীন প্রভাসের ভৌগলিক ও ভূতাত্ত্বিক বিবরণ থেকে সেখানকার গাছপালা ও প্রাণীদের বর্ণনা পর্যন্ত পাই। সুপণ্ডিত পুরাণকার এক গ্রন্থে প্রভাসের সীমা নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেছেন — তখনকার প্রভাসের উত্তরে ভদ্রানদী, পুবে তুলসী-শ্যাম, দক্ষিণে সাগর ও পশ্চিমে মাধবপুর অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ প্রভাসখণ্ডে দ্বারকা এবং গির্ণারকেও প্রভাসক্ষেত্রের অন্তর্গত বলা হয়েছে। এই গ্রন্থে সোমনাথে আদিজ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কাহিনীর বর্ণনাও আছে। অর্থাৎ প্রভাসখণ্ড রচিত হবার আগেই এখানে আর্য ও অনার্যদের মধ্যে একটা সন্ধি হয়ে গিয়েছিল। আর্যরা তখন অনার্য-ঈশ্বর শিবকে দেবতা বলে মেনে নিয়েছেন।"

"কিন্তু স্কন্দপুরাণ সপ্তম কিংবা অষ্টম শতাব্দীতে রচিত একথা বলছ কেন?" সত্যেনদা প্রশ্ন করেন।

"বলছি কারণ যদিও মহারাজ স্কন্দগুপ্ত খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে স্কন্দপুরাণ সম্পূর্ণ করার আদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু ঐতিহাসিকদের ধারণা প্রভাসখণ্ডটি শেষ করতে দু-তিন শ' বছর লেগেছিল।"

"তাহলে আমরা প্রভাসখণ্ডে প্রভাসের যে বর্ণনা পাই সেটি পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দীর?"

"তা বলতে পারেন।"

"বেশ। কি বলছিলে বল এবারে।" সত্যেনদা আমাকে বলে।

হেসে জিজ্ঞেস করি, "আর কি বলব? সবই তো বলেছি। এবারে তৈরি হয়ে নাও। ভেরাভল এসে গেল।"

ঘড়ির দিকে নজর দিয়ে ম্যানেজ্যার জানায়, "না। এখনও আধ-ঘণ্টা লাগবে।"

বিউটি কথা বলে এতক্ষণে, "কিন্তু মামু! আপনি তো চন্দ্রের গল্পটা বললেন না?"

"নাও। ঠেলা সামলাও এখন। বুঝলে ভাই, আমার গিন্নীকে ঠকানো অত সহজ নয়।" দাদা হাসতে হাসতে মন্তব্য করেন।

"দাদু, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।" বিউটি গম্ভীর স্বরে দাদাকে সাবধান করে।

"কেন?" দাদা হাসছেন।

"আপনি ভারী অসভ্য হয়েছেন।"

এবারে দাদার সঙ্গে আমরাও হেসে উঠি। বিউটি উঠে দাঁড়ায়।

তাড়াতাড়ি তার একখানি হাত ধরে পাশে বসিয়ে বলি, "তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? দাদা তো ঠাট্টা করেছেন। বেশ বোসো, আমি তারাপতি চন্দ্রের কাহিনী বলছি।"

বিউটি শান্ত হয়। আমি বলতে শুরু করি, "পুরাকালে প্রজাপতি দক্ষ তাঁর সাতাশটি মেয়েকেই তারাপতি চন্দ্রের হাতে সম্প্রদান করেছিলেন। মেয়েদের মধ্যে রোহিণী ছিলেন সবচেয়ে স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী। ফলে চন্দ্র রোহিণীর প্রতি বেশি আসক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি অন্যান্য দক্ষতনয়াদের অবজ্ঞা করে কেবল রোহিণীর সঙ্গে সুখ-সম্ভোগ করতে থাকলেন, একা তাঁকে নিয়েই মেতে রইলেন।

"চন্দ্রের অন্যান্য স্ত্রীরা ছুটে গেলেন দক্ষের কাছে। তাঁরা স্বামীর বিরুদ্ধে পিতার কাছে নালিশ করলেন।

"দক্ষ মেয়েদের নিয়ে চন্দ্রের কাছে এলেন। তিনি জামাইকে সাবধান করলেন— তুমি প্রত্যেক স্ত্রীকে সমান ভালোবাসো। নইলে

তোমার ঘোর অধর্ম হবে।

"চন্দ্র তখনকার মতো রাজী হলেন। সন্তুষ্ট দক্ষ বাড়ি ফিরে গেলেন। কিন্তু চন্দ্র তখনও রোহিণীর মোহে অন্ধ। তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলেন না।

"মেয়েরা আবার গেলেন বাবার কাছে। দক্ষ আবার তাঁদের নিয়ে চন্দ্রের কাছে এলেন। তাঁকে বললেন — তুমি কিন্তু অন্যায় করছ। তুমি যদি তোমার প্রত্যেক স্ত্রীকে সমান ভাবে ভালো না বাসো, তাহলে আমি তোমাকে অভিশাপ দেব। তুমি জানো যে আমার অভিশাপ মিথ্যে হবার নয়।

"চন্দ্র নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন। শ্বশুরকে বললেন — আর এমনটি হবে না এখন থেকে আমি সব স্ত্রীকে সমান ভালবাসব।

"কিন্তু চন্দ্রের তখনও রোহিণীর নেশা কাটে নি। তিনি এবারেও অন্যান্য স্ত্রীদের অবজ্ঞা করলেন।

"মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন বাবার কাছে। তাঁকে বললেন — চন্দ্র আমাদের ঘরে নিতে নারাজ। আপনার উপদেশ অগ্রাহ্য করে সে রোহিণীকে নিয়েই মেতে রয়েছে। আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

"ক্রুদ্ধ দক্ষ তখন যক্ষ্মার সৃষ্টি করলেন। তাঁর আদেশে যক্ষ্মা গিয়ে চন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করল। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন। চন্দ্রকিরণ স্তিমিত থেকে স্তিমিততর হতে থাকল।

"রোগমুক্তির জন্য চন্দ্র নানা যাগ-যজ্ঞের আয়োজন করলেন। কোন ফল হল না। তাঁর কিরণ স্তিমিত হয়ে গেল। নিস্তেজ চন্দ্র মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে থাকলেন।

"দেবতারা ছুটে এলেন তাঁর কাছে। তিনি তাঁদের কাছে নিজের পাপের কথা কবুল করলেন। বললেন, প্রজাপতি দক্ষের দেওয়া অভিশাপের কথা।

"দেবতারা দক্ষের কাছে গেলেন। তাঁকে বললেন — চন্দ্র স্তিমিত

হয়ে পড়ায় জগতের যাবতীয় ঔষধি লতা, ফুল-ফল ও বীজ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাঁর ক্ষয়রোগ বিশ্বসংসারকে ক্ষয় করে ফেলছে। আপনি তাঁকে শাপমুক্ত করুন।

"দক্ষ বললেন — আমার অভিশাপ মিথ্যে হবার নয়। তবে সে যদি তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সম্মত হয়, তাহলে আংশিক রোগ-মুক্ত হতে পাবে।

"— কি করতে হবে তাঁকে। দেবতারা জিজ্ঞেস করলেন।

"প্রজাপতি দক্ষ তখন দেবতাদের নির্দেশ দিলেন — তোমরা চন্দ্রকে গিয়ে বল, সে প্রথমে ভাস্করতীর্থে গিয়ে জ্যোতির্লিঙ্গের আরাধনা করে দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে নিজের কামান্ধতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুক। তারপরে সরস্বতীসাগর-সঙ্গমে স্নান করে তার প্রত্যেক স্ত্রীর প্রতি সমান প্রীতি প্রদর্শন করুক।

' — তাহলেই কি তিনি সম্পূর্ণ ক্ষয়মুক্ত হবেন? দেবতারা প্রজাপতি দক্ষকে জিজ্ঞেস করলেন।

"তিনি উত্তর দিলেন — না। চন্দ্র আর কখনো সম্পূর্ণ ক্ষয়মুক্ত হবে না। তবে আমার পরামর্শ মতো কাজ করলে চন্দ্রের পনেরো দিন করে ক্ষয় এবং পনেরো দিন করে শ্রীবৃদ্ধি লাভ ঘটবে। আর তার ফলে পৃথিবীতে কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের সৃষ্টি হবে।

"দেবতাদের পরামর্শে চন্দ্র তখন রোহিণীকে সঙ্গে করে সারস্বত-তীর্থে এলেন। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তিনি সোমনাথের করুণা প্রার্থনা করলেন। তারপরে চন্দ্র ও রোহিণী সরস্বতীসাগর-সঙ্গমে পুণ্যস্নান করলেন।

"চন্দ্রের অন্যান্য স্ত্রীরাও তখন পিতার পরামর্শে সেখানে এসেছিলেন। স্নান শেষে তীরে উঠে চন্দ্র তাঁদের সস্নেহে কাছে টেনে নিলেন, রোহিণী তাঁদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের ক্ষয়মুক্তি আরম্ভ হল। অমাবস্যার অন্ধকার দূর হয়ে পৃথিবী আবার চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আর সেদিন থেকেই সারস্বত-তীর্থের নাম হল প্রভাস — পুণ্যতীর্থ-প্রভাস।"

॥ ছয় ॥

সহযাত্রীরা স্নান ও তর্পণের জিনিসপত্র গুছিয়ে তৈরি হয়েই বসেছিলেন। এবারে ভেরাভল আসতেই গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। এত তাড়াহুড়া করার কোন দরকার ছিল না। সোমনাথ মেল তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছে। গাড়ি ছেড়ে দেবার কোন ভয় নেই।

তাহলেও আমার সহযাত্রীরা তাড়াহুড়া করছেন। কারণ একে তাঁরা পুণ্যতীর্থ-প্রভাসের দ্বারদেশে উপস্থিত, তার ওপরে ট্রেন প্রায় ঘণ্টাখানেক 'লেট'। ভক্তের মন তাই দেবদর্শনের জন্য উতলা হয়ে উঠেছে।

কিন্তু ট্রেন থেকে নেমেও তাঁদের ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। 'একটু দাঁড়ান' বলে ম্যানেজার সেই যে গিয়ে স্টেশন-মাষ্টারের ঘরে ঢুকেছে আর বেরুবার নামটি করছে না। সে নিশ্চয়ই অকারণে বসে নেই। সেখানে তার যে এখন অনেক কাজ—গাড়ি কাটানো ও পরিষ্কার করানো, আলো ও পাখা সারানো, ট্যাঙ্কে জল ভরানো এবং প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা।

সহযাত্রীরা সবাই এ-সব কথা জানেন। তবু তাঁরা ধৈর্যহীন হয়ে পড়েছেন। কি করবেন, পুণ্যার্থী মন কি পুণ্যতীর্থের দ্বারে পৌঁছে প্রতীক্ষা সইতে পারে?

তবে মজার ব্যাপার। সবচেয়ে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন উকিলবাবু, যিনি কখনও দেব-দর্শন করেন না। তিনি মন্দিরদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকেন, ভেতরে প্রবেশ করেন না। জিজ্ঞেস করলে বলেন—সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য।

অথচ তিনিই কর্কশ কণ্ঠে আমাকে বলে উঠলেন, "যান তো মশাই! ভেতরে গিয়ে একবার ম্যানেজারকে মনে করিয়ে দিন, আমরা এখানে তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে আছি।"

অমিয়বাবু কানে কম শুনলেও উকিলবাবুর বক্তব্য তাঁর কর্ণগোচর হল। তিনি প্রশ্ন করলেন, "ম্যানেজারবাবু কি রেলবাবুদের আড্ডায় বসে গেলেন?"

কি উত্তর দেব? স্টেশন-মাস্টারের ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলছে। ভেতরে বসে ম্যানেজার কি করছে, দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। তবে বিস্মিত হচ্ছি উকিলবাবু ও অমিয়বাবুদের কথা ভেবে। এতদিন ধরে পাঁচুবাবুকে দেখেও তাঁরা তাকে চিনতে পারলেন না। সে তার কর্তব্য সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকে। অযথা আড্ডা দেবার মানুষ পাঁচুগোপাল দে নয়।

তাহলেও বলার কিছু নেই। পাঁচজনকে নিয়ে চলতে হলে এ-সব কথা শুনতেই হয়। সুতরাং চুপ করে থাকি।

এবারে দিদি কথা বলেন। দিদি মানে শ্রীমতী সুরমা কুণ্ডু। না, কুণ্ডু স্পেশালের মালিকদের সঙ্গে তাঁর কোন আত্মীয়তা আছে বলে জানা নেই আমার। স্নেহশীলা ও ধর্মপরায়ণা এই ভদ্রমহিলাকে আমি প্রথম থেকেই দিদি বলে ডাকছি। তিনি বালবিধবা এবং নিঃসন্তান। ভাইদের সংসারে আছেন। কিশোর ভাইপো সৌম্যকান্তি তাঁর বর্তমান জীবনের প্রধান অবলম্বন। তীর্থদর্শন ছাড়া তিনি তাকে ফেলে কোথাও বের হন না। তীর্থ করতে এসেও ভাইপোকে ভুলতে পারছেন না। তাই প্রতি তীর্থে তার জন্য কিছু কেনা-কাটা - তেই হয় তাঁকে।

সেই কথাই দিদি বলেন আমাকে, "ম্যানেজারবাবুর খুব দেরি হলে, চল আমরা একটা টাঙ্গা করে বেরিয়ে পড়ি। আমার যে আবার একবার বাজারে যেতে হবে।"

হেসে বলি, "দিদি! এখানকার বাজার-মন্দির, সবই যে আমার অজানা। ম্যানেজার সঙ্গে না থাকলে তো আপনি কেনা-কাটা করতে পারবেন না।"

"তাহলে একবার ভেতরে গিয়ে দেখো না, ম্যানেজারবাবুর এত দেরি হচ্ছে কেন?"

না, আর তা দেখবার দরকার হয় না। ম্যানেজার বেরিয়ে আসে বাইরে। জিজ্ঞেস করে, "আপনারা সবাই 'রেডী' ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" সরকারদা উত্তর দেন, "এবারে আপনি 'গো' বললেই ছুট দিতে পারি।"

ম্যানেজার মৃদু হাসে। সে মতির সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা সেরে নেয়। ঠাকুর ও অন্যান্য তিনজন কর্মচারীর সঙ্গে মতি গাড়িতে থাকবে। বাজার ও রান্নার ব্যবস্থা করবে।

মতি গাড়িতে ফিরে যায়। ম্যানেজার বাণেশ্বরকে বলে, "টাঙ্গা-ওয়ালাদের সঙ্গে কথা বলেছিস ?"

"আজ্ঞে।"

"সব দেখিয়ে দেবে, কত করে চাইছে ?"

"আঠারো টাকা, তার মানে জনপ্রতি তিন টাকা।"

"ঠিক আছে। সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যা।"

"ক'খানা টাঙ্গা নেব বাবু ?"

একটু ভেবে নিয়ে ম্যানেজার উত্তর দেয়, "ছ'খানা।"

মতি মাথা নেড়ে এগিয়ে যায়, আমরা তাকে অনুসরণ করি।

শঙ্করীদের আবু রোডে ফেলে আসার পর থেকে আমরা একত্রিশ-জন যাত্রী রয়েছি গাড়িতে। ম্যানেজার ও বাণেশ্বরকে নিয়ে এখন তেত্রিশজন প্রভাসে চলেছি। কিন্তু ম্যানেজার ছ'টা টাঙ্গা নিয়েছে। একটি টাঙ্গায় ছ'জন যেতে পারে। অর্থাৎ ছত্রিশজনের জায়গায় আমরা তেত্রিশজন যাবো। তিনজনের বাড়তি জায়গাটুকু ম্যানেজার নিশ্চয়ই মিসেস উকিলের জন্য বরাদ্দ করেছে। ঠিকই করেছে, কারণ তিনি তাঁর বিপুলা বপু নিয়ে যে টাঙ্গায় সামিল হবেন, সেটিতে বড়-জোর আর জনদুয়েক যাত্রী বইতে পারবে ঘোড়াটি। বলা বাহুল্য সেই দু'জনের একজন উকিলবাবু এবং অপরজন স্বয়ং টাঙ্গাওয়ালা।

পৌনে দুটো নাগাদ টাঙ্গার শোভাযাত্রা শুরু হল। আমরা পুণ্যতীর্থ-প্রভাসের পথে রওনা হলাম। ভেরাভল থেকে প্রভাস পাঁচ মাইল। এখন ভেরাভল ও প্রভাস পৃথক শহর। সেকালে ভেরাভল

পর্যন্ত প্রভাসের সীমা বিস্তৃত ছিল। একালে কাথিওয়াড় উপদ্বীপে দক্ষিণ-উপকূলের প্রায় পুরো পশ্চিমাংশই হল ভেরাভল। কেবল তার পূর্ব প্রান্তটি প্রভাস ও সোমনাথ নামে পরিচিত।

শহুরে পথ ধরে দক্ষিণ-পূবে এগিয়ে চলেছে টাঙ্গা। প্রথমেই পথের ডানদিকে কেল্লা পেরিয়ে এলাম। তারপরেই শুরু হল বন্দর এলাকা।

পর পর দুটি রেল-লাইন পেরিয়ে এলাম। পথের পাশে প্রচুর নারকেল গাছ। এ অঞ্চলটা দ্বারকা কিংবা ওখার মতো রুক্ষ এবং বালিময় নয়। ভেরাভল আসার পথেই লাইনের দু'পাশে ক্ষেত-খামার ও সারি সারি কলাগাছ দেখেছি।

'ভেরাভল টেক্‌সটাইল এ্যাণ্ড্ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিল্‌স' ছাড়িয়ে এলাম। তারপরেই বাঁদিকে সাসানগিরের মোটরপথ চলে গেল। মনটা আবার ভারা হয়ে ওঠে। সাসানগির এখান থেকে মাত্র ২৭ মাইল। নিয়মিত বাস চলাচল করছে। তবু এ-যাত্রায় আমার গির জঙ্গলে যাওয়া হল না, দেখা হল না ভারতের পশু-রাজপরিবারকে।

একটা বিশ্রী গন্ধে বিচলিত হয়ে উঠি। তাড়াতাড়ি নস্যি নিই। কিন্তু নস্যির সাধ্য কি আমার নাসিকাদ্বয়কে এই উৎকট উগ্রগন্ধের কবল থেকে রক্ষা করে।

ম্যানেজার মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করে, "ঘোষদা, বলুন তো কিসের গন্ধ?"

"মনে হচ্ছে শুঁটকী মাছের!"

"ঠিকই ধরেছেন! ভেরাভল যে মাছ রপ্তানীর একটি বড় বন্দর।"

শুনেছি রান্না করার পরে শুঁটকী মাছ নাকি খুবই উপাদেয়। কিন্তু সুযোগ পেয়েও আমি তা আস্বাদন করতে পারি নি। কারণ এই গন্ধটির কথা মনে পড়লেই আমার রসনা বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

কিন্তু না। পুণ্যতীর্থের দ্বারে পৌঁছে আর যাই হোক্, শুঁটকী মাছের ভাবনায় সময় নষ্ট করা সমীচীন নয়। তার চেয়ে প্রভাসের কথাই ভাবা যাক্—পুরাণ নয়, ইতিহাসের প্রভাস।

যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যাবার পরে প্রভাসের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। তার অনেক পরে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে প্রভাস মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (খ্রীঃ পূঃ ৩২৬—৩০২) মন্ত্রী মহাপণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার (চাণক্য) পৃষ্ঠপোষকতায় সম্ভবতঃ প্রভাসে জ্যোতির্লিঙ্গ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই প্রথম বড় মন্দির নির্মাণ করে চন্দ্রনাথের প্রতিশব্দ রূপে লিঙ্গমূর্তির নাম রাখেন সোমনাথ।

তবে চাণক্যের আগেও এখানে অনেক মন্দির ছিল। কারণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব ৩১৯ অব্দে ব্রাহ্মণ্যধর্মের উৎকর্ষ সাধনের জন্য চাণক্য প্রভাসের বিষ্ণু, শিব, ভৈরব, বরুণ, মহাদেবী, গণেশ ও যম প্রভৃতির মন্দির সংস্কার করেন। অনেকের মতে প্রভাস খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের জনপদ। তাঁরা বলেন, ২৬০০ বছর আগে সোমরাজা সোমনাথ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তখন থেকেই সোমযজ্ঞ আরম্ভ হয়।

অনেকে মনে করেন বৌদ্ধধর্মের কবল থেকে সনাতন ধর্মকে রক্ষা করার জন্যই দূরদর্শী চাণক্য সেদিন বিষ্ণুতীর্থকে শৈবতীর্থের মর্যাদা দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে লিঙ্গপূজাকে কেন্দ্র করে আর্য ও অনার্যদের মাঝে মিলন ঘটবে। ফলে অনার্যদের মাঝে, বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণের প্রাবল্য হ্রাস পাবে। তিনি জানতেন শৈবধর্মের সারল্য যেমন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করবে, তেমনি সোমনাথকে করে তুলবে জনপ্রিয়।

দূরদর্শী চাণক্যের সেই পরিকল্পনা বিফল হয় নি। সোমনাথকে কেন্দ্র করে বিস্মৃতপ্রায় প্রভাসের এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তদল সোমনাথে আসতে শুরু করেন। প্রভাস আবার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

আর তখন থেকে সোমনাথ ও প্রভাসের একই ইতিহাস। সে ইতিহাস যেমন গৌরবের, তেমনি বিষাদের। কিন্তু ইতিহাস ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেয় না। সুতরাং আনন্দ ও বেদনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আমাকে প্রভাসের ইতিহাস স্মরণ করতে হবে।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী ও খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে প্রভাস শক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ১২৪ খ্রীষ্টাব্দে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী শক সম্রাট নাহপানকে (Nahpan) পরাজিত করে এ-অঞ্চল অধিকার করেন। নাহপান বৈদিকধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু একটি তারিখ শূন্য শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তাঁর জামাই উষবদত্ত তীর্থদর্শনে প্রভাস এসেছিলেন। এটি এখন পর্যন্ত প্রভাসে প্রাপ্ত প্রাচীনতম শিলালিপি।

শক ও কুশান সাম্রাজ্যের পতনের পরে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে গুপ্তবংশের অভ্যুত্থান ঘটে। গুপ্তরাজারা সৌরাষ্ট্র অধিকার করে জীর্ণাদুর্গ বা জুনাগড়ে তাঁদের আঞ্চলিক রাজধানী স্থাপন করেন।

গুপ্তযুগ (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতক) ভারতের স্বর্ণযুগ। গুপ্তরাজাদের আমলে প্রভাসেরও প্রভূত উন্নতি হয়। পণ্ডিতরা মনে করেন — গুপ্তযুগেই এখানে দৈত্যসূদন-মহাবিষ্ণু, চক্রধর-বিষ্ণু ও আদিনারায়ণ-হরির মন্দির নির্মিত হয়। শুধু তাই নয় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সম্রাট স্কন্দগুপ্তের আদেশে স্কন্দপুরাণের সঙ্কলন শুরু হয়। আর তারই ফলে আমরা পেয়েছি প্রভাসখণ্ড।

৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট স্কন্দগুপ্তের পরলোক গমনের পরে গুপ্ত-সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে গুপ্তরাজাদের স্থানীয় প্রতিনিধি সেনাপতি ভট্টার্ক সৌরাষ্ট্রকে স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করলেন। তিনি বল্লভীপুরকে রাজধানী করে সৌরাষ্ট্র শাসন করতে থাকলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশই বিখ্যাত বল্লভী রাজবংশ। এই রাজবংশ ৭১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় আড়াইশ' বছর ধরে সৌরাষ্ট্র শাসন করেছে। বল্লভীরা সূর্যসাধক ছিলেন। তাঁদের রাজত্বকালে প্রভাসে ষোলটি সূর্যমন্দির নির্মিত হয়েছিল।

৭১১ থেকে ৭২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সিন্ধুর আরব সেনাপতি জুনাইদ বল্লভীপুর আক্রমণ করেন। সেই যুদ্ধে বল্লভীরাজ সপ্তম শিলাদিত্য শহীদ হন এবং বল্লভীপুর ধ্বংস হয়ে যায়। অনেকে বলেন, প্রভাস সে-ধ্বংসলীলার কবলে পড়ে নি। আবার অনেকের

মতে কাঠের তৈরি সোমনাথের তৃতীয় মন্দিরটি তখনই ধ্বংস হয়ে যায়। বল্লভী রাজত্বকালে চাওড়া বংশীয় সামন্তরা রাজপ্রতিনিধিরূপে প্রভাস শাসন করতেন। তাঁরা ছিলেন যেমন ধার্মিক, তেমনি সত্যাশ্রয়ী। এই বংশের জনৈক সামন্তের নাম ছিল যোগরাজ। তাঁর শাসনকালে একজন বণিক যখন প্রভাস বন্দরে জাহাজ নোঙ্গর করেছিলেন, তখন যোগরাজের দুর্বিনীত পুত্র সেই বণিকের একহাজার ঘোড়া ও দেড়শ' হাতি লুঠ করে। সত্যাশ্রয়ী যোগরাজ লজ্জায় ও ঘৃণায় আত্মহত্যা করেন।

বল্লভীপুর ধ্বংস হয়ে যাবার পরে চাওড়া সামন্তরাই প্রভাসের প্রকৃত শাসক হলেন। তাঁরা অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত প্রভাস শাসন করেছেন। আর এই সময় চতুর্থ মন্দির তৈরি হয় এবং শুরু হয় সোমনাথের স্বর্ণযুগ। তখুনি প্রভাস-যাত্রা সারা ভারতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের রাজা-মহারাজারা এই পুণ্যতীর্থে আসতে থাকেন। তাঁরা সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তা দিয়ে সোমনাথের মন্দিরকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। এবং পুণ্যার্থীদের এই প্রবাহ বন্ধ হয় না।

৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজরাজ নাগভট্ট প্রভাসে আসেন। ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে চেদীরাজ লক্ষ্মণ এবং স্নিলহার-রাজ অনন্তদেও সোমনাথ দর্শনে আসেন। এঁরা প্রত্যেকে সোমনাথের জন্য প্রচুর মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে এসেছিলেন।

চন্দ্রচূড় নামে জনৈক যাদব নরপতি বানথালি রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রপৌত্র গ্রহ রিপু প্রভাসে আধিপত্য স্থাপন করেন। অহ্নিলপুরের রাজা মূলরাজকে তিনি প্রভাস দর্শনের অনুমতি দেন না। মূলরাজ ছিলেন সোমনাথের উপাসক। তিনি রিপুর এই অন্যায় আচরণ বরদাস্ত করলেন না। সোমনাথ দর্শনের মানসে তিনি সসৈন্যে প্রভাসের পথে বেরিয়ে পড়লেন এবং শেষ পর্যন্ত ৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এক প্রবলযুদ্ধে রিপুকে পরাজিত করে প্রভাসে প্রবেশ করেন। রিপুর চেয়ে তাঁর সৈন্যবল অনেক কম ছিল। কেবল সোমনাথের কৃপাতেই

তিনি নাকি সেই যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন।

তারপরেই সেই অভিশপ্ত ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দ। শুধু সোমনাথ নয়, কেবল সেকালের নয়, হাজার বছর পরেও সেটি আজ সারা ভারতের অভিশাপ হয়ে রয়েছে।

দশম শতাব্দীর শুরু থেকেই সোমনাথের ঐশ্বর্যের কথা দেশ ও বিদেশে রূপকথায় পর্যবসিত হয়েছিল। কারণ প্রভাস তখন শুধু পুণ্যতীর্থ ছিল না, ছিল পশ্চিম ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। গজনীর ধনলোভী ও নিষ্ঠুর সুলতান মাহ্‌মুদ সোমনাথের ঐশ্বর্যের কথা শুনে প্রলুব্ধ হলেন। ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর এক সুবিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি গজনী থেকে সোমনাথের পথে যাত্রা করলেন। ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, চুয়ান্ন হাজার পদাতিক, বিশ হাজার উট এবং কয়েক হাজার পরিচারক নিয়ে তিনি তাঁর সেনাদল গঠন করেছিলেন। বলা বাহুল্য উটগুলো আনা হয়েছিল লুণ্ঠিত দ্রব্য বহন করবার জন্য।

তাঁর এই অভিযান সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিকদের অভিমত — 'In 1025, Mahmud of Ghazni (971-1030 A. D.) embarked upon his most famous Indian exploit,........ to Somnath on the Kathiwar peninsula to sack the city of temple there.' (*Encylopædia Britannica* — Vol. 14)

পথের সমস্ত মন্দির ও মঠ ধ্বংস করে মাহ্‌মুদ ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী প্রভাসের উপকণ্ঠে উপস্থিত হলেন। তখনও প্রভাসদুর্গ তৈরি হয় নি। তাহলেও প্রভাসের মানুষ সেদিন সেই পরধর্মদ্বেষী ধনলোভী সুলতানকে সহজে পথ দেয় নি। তাঁরা জীবনপণ করে সর্বশক্তি দিয়ে মাহ্‌মুদকে বাধা দিয়েছিলেন।

পঞ্চাশ হাজার নওজোয়ান শহীদ হলেন। কিন্তু যা সম্ভব নয়, তা সম্ভব হল না। প্রভাসের মুক্তিকামী মানুষ হাজার হাজার হানাদারকে হত্যা করলেন। তবু প্রভাস পরপদানত হল।

তিনদিন যুদ্ধের পরে সোমনাথের শহীদদের শবদেহ মাড়িয়ে সুলতান মাহ্‌মুদ সোমনাথ মন্দিরে প্রবেশ করলেন। কারও মতে সেটি সোমনাথের তৃতীয় মন্দির, আবার কেউ বা বলেন, চতুর্থ। যাই হোক, মাহ্‌মুদ সে-মন্দিরে ঢুকে প্রথমেই সোমনাথের লিঙ্গমূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করলেন।

তারপরে শুরু হল লুণ্ঠন, নারীনিগ্রহ, ধর্ষণ ও হত্যা। প্রভাস নিয়ে যুদ্ধ এর আগেও বহুবার হয়েছে। কিন্তু বিজয়ীদের এমন পৈশাচিক আচরণ প্রভাস তার আগে কখনও দেখে নি।

আঠারো দিন ধরে চলল এই পাশবিকতা। কোন মন্দির ও গৃহ অলুণ্ঠিত রইল না, কোন যুবতী নারীত্ব রক্ষা করতে পারল না। কোন বিগ্রহ অক্ষত থাকল না, কোন দেবালয় অবিকৃত রইল না। সুলতানের আদেশে সৈন্যরা সোমনাথ ও অন্যান্য মন্দিরের দেওয়াল ও মেঝে খুঁড়ে-খুঁড়ে সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তা লুঠ করল। এমনকি মন্দিরের দরজাটি পর্যন্ত খুলে ফেলল তারা। মাহ্‌মুদ সেই কারুকার্য-খচিত কাঠের দরজাটি নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে করে। পরবর্তীকালে সেটি তাঁর সমাধিক্ষেত্রের শোভাবর্ধন করছিল। কিন্তু ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশরা কাবুল জয় করে বিজয়ের স্মারক স্বরূপ সেই দরজাটি ভারতে নিয়ে আসেন। এটি এখন আগ্রাদুর্গের সংগ্রহশালায় রয়েছে।

মাহ্‌মুদ ঐশ্বর্যশালী সোমনাথকে শ্মশানে পরিণত করেছিলেন। বিশ্বের ইতিহাসে বোধকরি এর আগে আর কখনও কেউ ধর্ম, সংস্কৃতি ও মানবতার ওপরে এমন নিষ্ঠুর আঘাত হানে নি। আঠারো দিন পরে মানব-ইতিহাসের সেই কলঙ্কিত নায়ক সুলতান মাহ্‌মুদ দেশের পথে রওনা হলেন, তখন তিনি বিশ্বের সবচেয়ে ঐশ্বর্যবান ব্যক্তি।

কিন্তু তাতেও তাঁর লোভ মেটে নি। হত্যালীলার পরে প্রভাসে যাঁরা জীবিত ছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে বেছে বেছে কয়েক হাজার স্বাস্থ্যবান যুবক ও সুন্দরী যুবতীকে শেকলে বেঁধে সঙ্গে নিয়ে চললেন। উদ্দেশ্য ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে কিছু বাড়তি আয় করা।

যাঁরা সেদিন সোমনাথে শহীদ হয়েছিলেন, তাঁরা সবাই আমাদের নমস্য। তাঁরা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনকে মহীয়ান করে তুলেছেন। কিন্তু সেই হতভাগ্য যুবক-যুবতীরা?

অক্টোপাশের দল তিল তিল করে যাঁদের জীবনীশক্তিকে শুষে নিয়েছে? যাঁরা বছরের পর বছর মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে জীবন যাপন করেছেন কিন্তু কোন প্রতিবাদ করতে পারেন নি। কাঁদতেও পারেন নি, হয়তো বা তাঁদের চোখের জলও গিয়েছিল শুকিয়ে। তাঁরাও আমার নমস্য। হাজার বছর পরে সোমনাথের সেই জীবন্ত-শহীদদের উদ্দেশ্যেও আমি জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

"ঘোষদা! এই হচ্ছে ভালকাতীর্থ।"

ম্যানেজারের ডাকে আমার ভাবনা থামে। আমি ইতিহাসের প্রভাস থেকে ফিরে আসি বর্তমানের প্রভাসে।

টাঙ্গা চলেছে প্রভাসের পথ দিয়ে। যে-পথ দিয়ে একদিন কৃষ্ণ, বলরাম ও পাণ্ডবরা পথ চলেছেন, যে-পথ একদিন সুলতান মাহ্‌মুদের নৃশংসতার সামিল হয়েছে, সেই পথ — পুণ্যতীর্থ-প্রভাসের পুণ্যপথ, শহীদতীর্থ সোমনাথের মুক্তিপথ।

পথের পাশে সুন্দর একটি নবনির্মিত মন্দিরের দিকে ম্যানেজার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

আমি দেখি আর ভাবি — পারে নি। ওরা পারে নি। সুলতান মাহ্‌মুদ, আলাউদ্‌দিন আর আওরঙ্গজেবের দল প্রভাসকে ধ্বংস করতে পারে নি। প্রভাস আছে, চিরকাল থাকবে। সত্য ও সুন্দরের মৃত্যু নেই।

"ভালকাতীর্থ কি মামা?" বিউটি প্রশ্ন করে।

ম্যানেজার উত্তর দেয়, "যেখানে শ্রীকৃষ্ণ মর্তলীলা সাঙ্গ করেছেন।"

"কিন্তু টাঙ্গা থামছে না কেন?" বিউটি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

"টাঙ্গা থামবে না এখানে।" ম্যানেজার বলে।

"বারে! আমরা ভালকাতীর্থ দেখব না!"

"দেখব।"

"তাহলে ?"

"এখন আমরা সোজা ত্রিবেণীতে যাবো। সেখানে স্নান ও তর্পণ শেষ হলে খাওয়া-দাওয়ার পরে প্রভাস ও সোমনাথ দর্শন করব। ফেরার পথে এখানে নামব।"

বিউটি শান্ত হয়। টাঙ্গার শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে। ভালকা-তীর্থ ভেরাভল ও প্রভাসের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। তার মানে আমরা অর্ধেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি।

আমাদের টাঙ্গা রয়েছে প্রথমে আর উকিলবাবুর টাঙ্গা আসছে শেষে। ম্যানেজার সবার দিকে দৃষ্টি রাখছে।

শুঁটকীর গন্ধ এখনও রয়েছে তবে পথের প্রকৃতি পালটেছে। বাড়ি-ঘর ও কল-কারখানা কমেছে, বেড়েছে সারি সারি ঝাউ গাছ চড়া রোদ উঠেছে কিন্তু বেশ বাতাস বইছে। তাই গরম লাগছে না। শুধু সেই বাতাসে ভর করে শুঁটকীর গন্ধ নাকে আসছে, এই যা।

ডানদিকে একটা খাঁড়ি। অনেক লোকজন সেখানে। সমুদ্র-গামী নৌকো সারানো হচ্ছে।

বাঁদিকে আরেকটা মন্দির। টাঙ্গাওয়ালা জানায়, "কৃষ্ণ-ভগবানকা মন্দির।"

নির্ভুল উত্তর। আমিও বলতে পারতাম। বৃন্দাবন আর দ্বারকার মতো প্রভাসও কৃষ্ণময়। এখানকার যেকোন মন্দির দেখিয়েই বলা যেতে পারে—কৃষ্ণমন্দির।

ডানদিকে একটা দরগা! টাঙ্গাওয়ালা জানায়, "হাজী মংরুলিশাহের দরগা। ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এখানে দেহরক্ষা করেন। প্রতিবছর হাজার হাজার ভক্ত এই দরগা দর্শনে আসেন।"

দরগা ছাড়িয়ে টাঙ্গা এগিয়ে চলে। প্রভাস শুধু হিন্দু ও জৈন-তীর্থ নয়। মুসলমানদেরও বহু দর্শনীয় আছে এখানে। আছে আরও দুটি দরগা এবং পাঁচটি মসজিদ। আগে সেগুলি অবশ্য সবই হিন্দু মন্দির ছিল। সোমনাথের মন্দিরও একসময়ে কিছুদিনের জন্য মসজিদে পরিণত হয়েছিল।

লোকালয় শেষ হয়ে গেল, শুরু হল ক্ষেত। মাঝে মাঝে বাবলা বন। নারকেল গাছ তো রয়েছেই। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি। বেশ ভালো লাগছে।

উমাদি নীরবতা ভঙ্গ করেন। বলেন, "আচ্ছা ঘোষদা, স্কন্দ-পুরাণের প্রভাস খণ্ডে নাকি দধীচির কাহিনী রয়েছে ?"

"হ্যাঁ।" আমি উত্তর দিই।

"কিন্তু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বৃত্রসংহার কাব্যে' তো বলেছেন, দধীচি বদরিকা আশ্রমে তপস্যা করেছিলেন।"

"তাহলেও প্রভাসখণ্ডে দধীচির কাহিনী রয়েছে।"

"কাহিনীটা কি ?" বিউটি গল্পের গন্ধ পেয়েছে।

হেসে বলি, "বলতে হবে, তাই তো।"

বিউটি মাথা নাড়ে।

আমি বলতে থাকি, "দধীচি একজন পৌরাণিক ঋষি। বেদে দধ্যঞ্চ্ এবং মহাভারতে দধীচ ও দধীচি নামে খ্যাত। যাস্ক রচিত নিরুক্তের মতে তিনি অথর্বার পুত্র, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে শুক্রাচার্যের পুত্র আবার অন্যান্য পুরাণে তিনি অথর্বের ঔরসে কর্দমকন্যা শান্তির পুত্র।

"কথিত আছে দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি দধীচিকে প্রবর্গ্যবিদ্যা ও মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে সাবধান করেছিলেন — যদি তুমি কাউকে এই বিদ্যা দান কর, তাহলে আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব।

"স্বর্গের বৈদ্য দুই অশ্বিনীকুমার খবর পেয়ে ছুটে এলেন দধীচির কাছে। তাঁরা তাঁকে ইন্দ্রবিদ্যা দান করতে অনুরোধ করলেন। দধীচি তখন ইন্দ্রের প্রতিজ্ঞার কথা বললেন তাঁদের। তাঁরা তৎক্ষণাৎ দধীচির মাথাটি কেটে রেখে……"

"মাথা কেটে ফেললেন!" বিউটি সবিস্ময়ে বলে ওঠে। "তাহলে তো দধীচি মরে গেলেন ?"

"না। অশ্বিনীকুমাররা যে মস্ত বড় 'সার্জন্' ছিলেন। তাঁরা দধীচির ঘাড়ে একটা ঘোড়ার মাথা বসিয়ে দিলেন। আর সেই ঘোড়ার মুখ থেকেই প্রবর্গ্যবিদ্যা বা ত্রয়ী অর্থাৎ ঋক সাম যজুঃ এবং

মধুবিদ্যা আয়ত্ত করলেন।

"যথাসময়ে ইন্দ্রের কানে কথাটা গেল। তিনি দধীচির সেই ঘোড়ার মাথাটি কেটে ফেললেন। অশ্বিনীকুমাররা তাড়াতাড়ি তখন দধীচির ঘাড়ে মহর্ষির নিজের মাথাটি লাগিয়ে দিলেন। দধীচি যেমন ছিলেন, তেমনি হলেন।

"তারপরেই দধীচি এলেন সরস্বতী-সাগর সঙ্গমে। শুরু করলেন কঠোর তপস্যা। দেবলোকে ইন্দ্রের আসন টলে উঠল। তিনি অলম্বুষা নামে জনৈকা অপ্সরাকে পাঠিয়ে দিলেন প্রভাসে। রূপসী অলম্বুষা সম্পূর্ণ নিরাবরণা হয়ে দধীচির সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি নাচ-গান করে দধীচির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হলেন। তাঁর অপরূপা দেহের দিকে তাকাতেই দধীচির রেতস্খলিত হল। সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী সেই বীর্যধারণ করে পুত্রবতী হলেন। দধীচির পুত্র সারস্বতের জন্ম হল।

"দধীচি তখন হিমালয়ে চলে গেলেন। বদ্রীনাথে বসে তপস্যা করে তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন।

"কিছুকাল পরে বৃত্রাসুরের অত্যাচারে দেবতারা অস্থির হয়ে উঠলেন। ইন্দ্র জানতে পারলেন, দধীচির অস্থিনির্মিত বজ্র না হলে বৃত্রাসুরের বিনাশ হবে না।

"বাধ্য হয়ে দেবরাজ গেলেন দধীচির কাছে। তিনি তাঁর অস্থি ভিক্ষা করলেন। মহান ঋষি দেবরাজের অপরাধ ক্ষমা করলেন। তিনি তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। দেবলোকের মঙ্গলের জন্য মহর্ষি দধীচি সানন্দে দেহত্যাগ করলেন।

"দধীচির অস্থি থেকে নির্মিত হল বজ্র। সেই বজ্রের আঘাতে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করলেন।"

আমি থামতেই উমাদি 'বৃত্রসংহার কাব্য' থেকে আবৃত্তি শুরু করলেন।

"মুনি-শোকে অকস্মাৎ অচল পবন,
তপনে মৃদুল রশ্মি, স্নিগ্ধ নভস্থল,

সমূল অরণ্য ভেদি সৌরভ উচ্ছ্বাস,
বনলতা তরুকুল শোকে অবনত!
দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিঃশ্বাসশূন্য, নিস্পন্দ ধমনী,
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মারন্ধ্র ফুটি
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ — ক্ষণে শূন্যে উঠি
মিশাইল শূন্যদেশে। বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য — হরিশঙ্খ; শূন্যদেশ যুড়ি
পুষ্পাসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি!
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।"

॥ সাত ॥

উমাদির কথাই ভাবছিলাম টাঙ্গায় বসে বসে। উমাদির পুরো নাম উমা মিত্র। বেশ ছিমছাম স্মার্ট চেহারা। বয়স চার-এর ঘরে। লেখাপড়া জানেন। বহুতীর্থ ভ্রমণ করেছেন। বিয়ে করেন নি। সংসারে তেমন আপন বলতে কেউ নেই বলেই বোধহয় সবাই তাঁর আপনজন।

উমাদির জীবনে প্রধান অবলম্বন গোপাল — গোকুলের যশোদা দুলাল। একটি নয়, দুটি গোপাল। একটি ছোট ও একটি মাঝারি মূর্তি। দুটিই পেতলের। দু'জনেই হামাগুড়ি দিচ্ছে।

তাদের সব আছে — জামা-কাপড়, থালা-বাসন, বিছানাপত্র। উমাদি সারাদিন মাতৃস্নেহে সেবা করেন তাদের — ঘুম ভাঙানো, মুখ ধোয়ানো, খাবার খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো। উমাদির অনেক কাজ, তবু তিনি সময় করে সবার খোঁজ-খবর করেন। কারও কোন প্রয়োজন জানতে পারলেই হয়, তিনি যেমন করেই পারেন, তা করে ছাড়বেন। এমন পরোপকারী মহিলা খুব কমই দেখেছি।

"এই রাস্তাটা সোমনাথের মন্দিরে গিয়েছে।" ম্যানেজারের কথায় উমাদির কথা হারিয়ে যায়।

"আমরা এখন ত্রিবেণীতে চলেছি, তাই না?" উমাদি প্রশ্ন করেন।

ম্যানেজার উত্তর দেয়, "হঁ্যা, প্রভাসে এসে প্রথম সেখানে স্নান ও তর্পণ সেরে নিতে হয়, তারপরে অন্য দর্শন।"

টাঙ্গা এগিয়ে চলেছে। পথের দু-পাশেই গাছ-পালা, মাঝে মাঝে বাড়ি-ঘর। খানিকটা এগিয়ে টাঙ্গা একটা নতুন রাস্তা ধরল। ম্যানেজার বলল, "বড় রাস্তাটা উনা চলে গেল। আমরা চলেছি প্রভাসে, বর্তমান নাম প্রভাস-পাটন।"

এখন আমাদের পথের পাশে মাঝে মাঝেই বাড়ি-ঘরের ধ্বংসাবশেষ। কোথাও কোথাও ইট আর পাথরের ঢিবি। তাদের ঘিরে ঝোপঝাড়। বড় বড় গাছপালাও গজিয়েছে দু-চার জায়গায়। মনে হচ্ছে একটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পরিত্যক্ত জনপদের পথ চলেছি।

পথটা সামনের দিকে ঢালু হয়ে গিয়েছে। উৎরাই পথ পেয়ে আমাদের ঘোড়া জোর-কদমে ছুটেছে। এখন পথের পাশে নারকেল আর ঝাউগাছের সারি। ঝাউয়ের ডালে ডালে জোর হাওয়া লেগেছে। শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। এই শব্দটা শুনলেই আমার কৈশোরকালের কথা মনে পড়ে। বরিশালে কীর্তনখোলার তীরে তীরে ঝাউয়ের সারিতে সারাদিন এমনি শব্দ হয়। সে-শব্দ শোনার সুযোগ জীবনে হয়তো আর হবে না আমার।

কিন্তু না বাংলাদেশের বরিশালের কথা থাক্, জন্মভূমি হলেও বরিশাল আমার কাছে এখন বিদেশ। ভারত আমার দেশ। আমি ভারতের প্রভাসের কথায় ফিরে আসি। ঢালু পথটি সমতলে এসে মিশল। আর সেখানেই টাঙ্গা থেকে নামতে হল আমাদের। আমরা পুণ্যতীর্থ-প্রভাসের ত্রিবেণীতে পৌঁছে গিয়েছি।

ধূলিময় অপ্রশস্ত পথের ডানদিকে খানিকটা দূরে একটি মন্দির। বাঁদিকে কয়েকটি অস্থায়ী দোকানঘর। তারই দুটি দোকানের

মাঝখান দিয়ে মাটির একটি পায়ে-চলা পথ নেমে গেছে নিচের দিকে। সেই পথ বেয়ে কয়েকটি পিপল গাছ ছাড়িয়ে আমরা একফালি বালিময় প্রান্তরে পৌছলাম।

পাণ্ডাজী বললেন, "এই হল প্রভাসের ত্রিবেণী সঙ্গম।"

না, প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী সঙ্গমের মতো মোটেই সুন্দর ও সুবিশাল নয়। বালিময় প্রান্তরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে একটি নাতিপ্রশস্ত অগভীর জলধারা — অনেকটা খাড়ির মতো। খানিকটা দূরে গিয়ে সেটি সাগরে মিশেছে।

কিন্তু একে ত্রিবেণী বলা হচ্ছে কেন? তিনটি নদী তো দেখতে পাচ্ছি না।

পাণ্ডাজী জানান, "এটিই সরস্বতী, কপিলা ও হিরণ্যর মিলিত-ধারা — পুণ্যতীর্থ প্রভাসের পুণ্যধারা।"

"কোন সরস্বতী? ভারতে যে সরস্বতী নামে অনেক নদী আছে।"

দাদার সংশয় দূর করার জন্য পাণ্ডাজী বলেন, "ঋগ্বেদ পরিশিষ্টে যে সরস্বতীর কথা বলা হয়েছে।"

"কি বলা হয়েছে ঋগ্বেদে?"

"বলা হয়েছে হিমালয়ের প্লাক্ষা প্রস্রবণ থেকে সৃষ্ট হয়ে রাজস্থান ও গুজরাতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে প্রভাসে এসে সমুদ্রে মিশেছে। ঋগ্বেদের ভাষায়—

'একা চেতৎ সরস্বতী নদীনাং
শুচির্যতী গিরিভ্য আসমুদ্রাৎ।'

স্কন্দপুরাণের প্রভাস খণ্ডে আছে — প্রাচী সরস্বতী কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর ও প্রভাস দিয়ে প্রবাহিতা।"

একবার থামেন পাণ্ডাজী। তারপরে আবার বলতে থাকেন, "তবে বিভিন্ন পুরাণের বর্ণনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় — সরস্বতী নদী হিমালয় থেকে সৃষ্ট হয়ে রাজস্থানের মরুভূমিতে হারিয়ে গিয়েছে। তারপরে আবার রাজস্থানেরই আবু পাহাড় থেকে তার চলা শুরু করে কচ্ছের মরুপ্রান্তরে অদৃশ্য হয়েছে। অবশেষে

গির জঙ্গলে দেখা দিয়ে প্রভাসে এসে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে সরস্বতীর পুণ্যধারা।”

পুণ্যধারা তো বটেই। যুগাতীত কাল ধরে আমার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ এই পুণ্যবারি স্পর্শ করবার জন্য ছুটে এসেছেন এই পুণ্যতীর্থে। এসেছেন শঙ্করাচার্য, বল্লভাচার্য ও বিবেকানন্দ এবং আরও কত যুগাবতার। তাঁদের প্রত্যেকের পদরেণুরঞ্জিত এই পুণ্যতীর্থ। আমি প্রণাম করি।

ঘাটে বসে স্নান তর্পণ করে আমরা ত্রিবেণী মন্দিরে এলাম। গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর মূর্তি রয়েছে। কিন্তু গঙ্গা-যমুনা কেন, হিরণ্য ও কপিলা কোথায় গেলেন? কি জানি হয়তো গঙ্গা-যমুনাই এখানে হিরণ্য-কপিলা রূপে পরিচিতা।

রাম মন্দির ও মঙ্কেশ্বর মন্দির দর্শন করে আমরা আবার উঠে আসি পথে। কালো কাপড় পরে কয়েকজন মহিলা ত্রিবেণীতে চলেছেন।

বিউটি জিজ্ঞেস করে, “এরা সবাই কালো শাড়ী পরেছেন কেন? কেউ মারা-টারা গিয়েছেন নাকি?”

“হ্যাঁ।” ম্যানেজার উত্তর দেয়।

“কে?”

“কৃষ্ণ।”

“ধ্যেৎ! আপনি বড্ড হেয়ালি করেন।”

ম্যানেজার মৃদু হাসে। বলে, “হেয়ালী নয়, সত্যি কথাই বলছি। এঁরা সবাই রাধাবংশজাত আহীর। শ্রীকৃষ্ণকে এঁরা পরমপতি বলে মনে করেন, তাই আজও কৃষ্ণ বিরহিনী। হাজার হাজার বছর ধরে পুরুষানুক্রমে কালো কাপড় পরে এঁরা শ্রীকৃষ্ণের জন্য শোকপালন করছেন।”

বিউটির বোধহয় বিশ্বাস হয় নি এখনও। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

বলি, “ম্যানেজার ঠিকই বলেছে। আমার কাছে ‘Fodor s

India' বইটা আছে। গাড়িতে গিয়ে দেখো, তাতে লেখা রয়েছে—'The Ahir Women of this area, members of the same clan of Radha, Krishna's consort, wear black in what must be the longest mourning in history.'

রাস্তার ওপারেই সূর্যমন্দির। অনেকগুলি সিঁড়ি পেরিয়ে আমরা মন্দিরে উঠে আসি। শুনেছি মহারাজা সাগরদিত্য এই মন্দির নির্মাণ করেছেন। এটি প্রভাসের প্রাচীনতম মন্দিরগুলির অন্যতম। সম্ভবতঃ সোমনাথের মন্দির থেকে খানিকটা দূরে বলেই পরধর্মদ্বেষীদের তেমন নজরে পড়ে নি, মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় আজও টিকে আছে।

পাথরের ছোট মন্দির। প্রথমে নাট-মন্দির, তারপরে গর্ভ-গৃহ। গর্ভ-মন্দিরে পেছনের দেওয়ালটি সুচিত্রিত। ঠিক কেন্দ্রস্থলে এক-জোড়া চোখ, নাক ও মুখ আঁকা। পাণ্ডাজী বলেন, "সূর্যনারায়ণ।"

বেদির ওপরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহটি দেখিয়ে ছোট-ঠাকুরমা জিজ্ঞেস করেন, "তাইলে উনি কেডা ?"

পাণ্ডাজী প্রভাসের মানুষ। তাহলেও বাঙালী যাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করে তিনি বেশ ভাল বাংলা বুঝতে পারেন। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, "উনি সূর্যপত্নী সংজ্ঞাদেবী।"

বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞা সূর্যের প্রথমা পত্নী। তাঁর গর্ভে সূর্যপুত্র বৈবস্বত মনু ও কন্যা যমুনার জন্ম হয়। কথিত আছে সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করতে না পেরে তাঁর ছায়াকে কামিনীতে পরিণত করে তাঁকে স্বামীর কাছে রেখে পালিয়ে যান। ছায়ার ঔরসে সূর্যপুত্র শনি ও কন্যা তপতীর জন্ম হয়। পরে সংজ্ঞার গর্ভে তাঁর আরও পুত্র হয় তাঁদের মধ্যে স্বর্গের বৈদ্য অশ্বিনীকুমার দু'জন অন্যতম। আর সূর্যের ঔরসে কুমারী কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়েছিল।

পূজারী চরণামৃত ও আশীর্বাদ দিলেন। আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে গ্রহণ করি। তারপরে ঘুরে ঘুরে মন্দিরটি দেখি। স্বামী বিবেকানন্দের ছবিখানি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শঙ্করাচার্যকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে নেমে

আসি সূর্যমন্দির থেকে। সূর্যকুণ্ড দর্শন করে পাণ্ডাজীর সঙ্গে একটি সুড়ঙ্গের সামনে এসে দাঁড়াই। কাঁধের থলি থেকে টর্চ বের করে পাণ্ডাজীর পেছনে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করি। কয়েক পা হেঁটেই একখানি মাঝারী আকারের মাটির ঘরে পৌঁছই। সিঁদুর মাখানো কয়েকখানি ত্রিশূল ও একটি সূর্যমূর্তি রয়েছে।

পাণ্ডাজী বলেন, "এই পথে পঞ্চ-পাণ্ডব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।"

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, মিসেস উকিল সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর চোখদুটি করুণ। তিনি করুণকণ্ঠেই জিজ্ঞেস করেন আমাকে, "ভেতরে কি আছে বাবা?"

তিনি তাঁর সুবিশাল দেহ নিয়েও প্রায় প্রতিটি তীর্থ দর্শন করে চলেছেন কিন্তু তাঁর পক্ষে এই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

বলি, "তেমন কিছু নয়। কয়েকটি ত্রিশূল ও একটি সূর্যমূর্তি।"

"আচ্ছা পাণ্ডাজী যে বললেন, এটি পাণ্ডবদের গুহা! কথাটা কি সত্যি?"

"না। প্রথমতঃ এটি কোন গুহাপথ নয়। সুড়ঙ্গটা একটা ঘরে গিয়ে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পাণ্ডবরা গোপন পথে প্রভাসে আসবেন কেন? তখনও তো তাঁদের অজ্ঞাতবাস আরম্ভ হয় নি।"

"তাহলে এটা কি?"

"আমার মনে হয়, পরধর্মদ্বেষীদের কবল থেকে বিগ্রহকে রক্ষা করার জন্য সেবাইতরা মাটির নিচে এই ঘরটি তৈরি করেছিলেন। সুবিধাবাদীরা এখন তার সঙ্গে পঞ্চ-পাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণকে যুক্ত করার চেষ্টা করছেন।"

"আরেকটা কথা..."

"বলুন।"

"আচ্ছা, আমি একখানি বইতে পড়েছি, এখানে নাকি পাঁচটা গুহা আছে, সেখানে পঞ্চ-পাণ্ডব তপস্যা করেছেন?"

"গুহা থাকতে পারে; কিন্তু সেগুলির সঙ্গে পঞ্চ-পাণ্ডবের তপস্যার

কোন সম্পর্ক নেই।"

"কেন?"

"পাণ্ডবরা কখনও প্রভাসে কোন তপস্যা করেন নি। তাছাড়া পাঁচভাই একসঙ্গেও প্রভাস আসেন নি। আদিপর্ব এবং মৌষলপর্বে অর্জুন একা আর বনপর্বে চারভাই ও দ্রৌপদী প্রভাসে এসেছেন।"

মিসেস উকিল সন্তুষ্টচিত্তে সামনে এগিয়ে চলেন।

সূর্যনারায়ণ মন্দিরের ডানদিকে শ্রীসারদা মঠ। আমরা সেখানে এলাম। দেখে মনে হচ্ছে মঠটি নবনির্মিত। পাণ্ডাজী আমার অনুমান সমর্থন করেন।

প্রথম মন্দিরে শ্রীনাথজী, নৃসিংহদেব, দেবী ভগবতী ও গণপতির মূর্তি রয়েছে। আমরা দর্শন করে দ্বিতীয় মন্দিরে আসি। এটিকে মন্দির না বলে গদি বলাই উচিত হবে — শঙ্করাচার্যের গদি।

গদির ওপরে একজোড়া রুপোর খড়ম ও আদি-শঙ্করাচার্যের কাল্পনিক ছবি। চারদিকের দেওয়ালে আরও কয়েকজন আচার্যের ছবি। তাঁদের মধ্যে ত্রিবিক্রমানন্দ ও স্বরূপানন্দের ছবি দুখানি ভাল লাগে আমার।

প্রণাম করে বেরিয়ে আসি বাইরে। জনৈক দণ্ডীস্বামী এই মঠের অধ্যক্ষ। পাণ্ডাজী আলাপ করিয়ে দেন তাঁর সঙ্গে। অমায়িক ও ভক্ত সন্ন্যাসীকে ভাল লাগে আমার। আমি তাঁকে প্রণাম করি।

কামনাথ ও ব্রাহ্মীস্বামী মন্দির দর্শন করে টাঙ্গায় ফিরে আসি। টাঙ্গা এগিয়ে চলে।

একটু বাদে দিদি বলেন, "এখানে আবার সারদা মঠ কেন? সারদা মঠ তো দ্বারকায়! আমরা দর্শন করেছি।*"

"হ্যাঁ।" উত্তর দিই, "এটি তার একটি শাখা। সেটি জগদ্‌গুরু আদি শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত আর এটি হালে তৈরি।"

"তাই বল।" দিদির বিভ্রান্তি দূর হয়।

অমিয়বাবু ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করেন, "এবারে আমাদের

* লেখকের 'মন-দ্বারকায়' দ্রষ্টব্য।

কোথায় নিয়ে চলেছেন মশায় !"

"গীতা মন্দিরে।" ম্যানেজার উত্তর দেয়।

অমিয়বাবু আবার প্রশ্ন ছাড়েন, "কতগুলো গীতা মন্দির আছে এদেশে ?"

"আপনি আবার কোথায় গীতা মন্দির দেখলেন ?"

"কেন, ঋষিকেশে। মানে লছমনঝুলায়।"

"সে তো গীতা ভবন।" ম্যানেজার অমিয়বাবুর ভুল ধরিয়ে দেয়।

"ঐ হল আর কি। যা মন্দির, তাই ভবন।"

"যেমন যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ — কি বলেন ?"

"তা যা বলেছেন।"

আমরা সোচ্চার স্বরে হেসে উঠি। এবং অমিয়বাবুও সে হাসির সামিল হন।

কিন্তু বেশিক্ষণ হাসবার সময় পাওয়া গেল না। টাঙ্গা থেমে গেল। আমরা গীতা মন্দিরের সামনে পৌছে গিয়েছি।

পথের পাশেই মন্দির-তোরণ। সুন্দর ও ঝক্‌ঝকে মন্দির। মাত্র বছর দশেক আগের তৈরি।

দেওয়ালঘেরা বেশ বড় এলাকা নিয়ে মন্দির। তোরণ থেকে কয়েক পা সামনে হেঁটে বাগান পেরিয়ে বাঁদিকে মন্দিরদ্বার। কারুকার্যখচিত চারটি শ্বেতপাথরের গোল স্তম্ভে সুশোভিত। আমরা কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে সুবিশাল নাট-মন্দিরে উঠে আসি। শ্বেতপাথরের মেঝে ও দেওয়াল। দেওয়ালে অষ্টাদশ অধ্যায় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সমস্ত শ্লোক লেখা। জামনগরের মহারাজা দিগ্বিজয়সিংজী ১৯৬৩ সালের ২০শে এপ্রিল এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

নাট-মন্দিরের শেষে সুদৃশ্য গর্ভ-মন্দির। ভেতরে শ্বেতপাথরের বেদির ওপরে শ্যামবর্ণ পাথরের ঘনশ্যাম। বংশীধারী নৃত্যরত কিশোর-কৃষ্ণ। পরণে ধুতি, কব্জি বাহু ও গলায় মূল্যবান অলঙ্কার। ভারী সুন্দর প্রাণময় মূর্তি। আমার হৃদয় ও মন আনন্দে ভরে ওঠে।

আমি মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে থাকি মুরলীধারীর দিকে।

গীতা মন্দিরের পাশেই বলদেও গুফা বা বলরামের গুহা। পাণ্ডাজীর সঙ্গে সেখানে আসি। পাণ্ডাজী বলেন, "শ্রীবলদেব এই পথে পাতাল-প্রবেশ করেছিলেন।"

এবারেও মিসেস উকিল আমাদের সঙ্গী হতে পারলেন না। কারণ এটিও মাটির নিচে একখানি ঘর। সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে সেখানে পৌঁছন সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। তেমনি করুণচোখে তিনি তাকিয়ে রইলেন আমাদের দিকে।

আমরা নেমে এলাম নিচে। ছোট ঘর। প্রদীপের ম্লান আলোয় আঁধার কাটে নি। কিন্তু ধূপ আর ফুল-চন্দনের গন্ধে আমোদিত হয়ে আছে।

এক পাশে একটি বেদির ওপরে শ্বেতপাথরের বলদেব। ভারী সুন্দর মূর্তি। পাণ্ডাজী বলেন, "১৯৬৭ সালের ১৯শে মে শ্রীজয়শুক-লাল হাতি এই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন।"

বলদেবের পাশেই একটি ছোট লিঙ্গমূর্তি। ঠাকুরমারা বাবার মাথায় জল ঢাললেন। আমরা শুধু প্রণাম করে উঠে এলাম ওপরে।

লক্ষ্মীনারায়ণ এবং ওঙ্কারেশ্বর মন্দির দর্শন করে পাণ্ডাজীর সঙ্গে ফিরে এলাম গীতা মন্দিরের সামনে। পাণ্ডাজী কিন্তু থামলেন না। আমরা তাঁকে অনুসরণ করি।

কয়েক পা এগিয়েই দেওয়াল ঘেরা একফালি জায়গা। তার ঠিক মাঝখানে একটি গোড়া-বাঁধানো অশ্বত্থ গাছ। পাণ্ডাজী বলেন, "এই হল শ্রীকৃষ্ণের দেহোৎসর্গের স্থান। আপনারা জানেন জরা ব্যাধ যেখানে শ্রীকৃষ্ণকে বাণবিদ্ধ করেছিলেন। সেটি ভালকাতীর্থ। আমরা পরে সেটি দর্শন করব। ভালকাতীর্থ থেকে আহত কৃষ্ণকে নিয়ে আসা হয়েছিল এখানে। এখানেই তিনি মর্ত্যলীলা সাঙ্গ করেছিলেন। আর সামনের ঐ শুকনো নালাটাই হিরণ্য নদী।"

মহাভারতের সেই অধ্যায়টি মনে পড়ে আমার। আমি চোখ বুজে ভাবতে থাকি —

…'বনে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, বলরাম সেখানে ব'সে আছেন, তাঁর মুখ থেকে একটি শ্বেতবর্ণ সহস্রশীর্ষ রক্তমুখ মহানাগ নির্গত হ'য়ে সাগরে প্রবেশ করছেন।……

'অগ্রজ বলদেবের দেহত্যাগ দেখে কৃষ্ণ সেই বনে কিছুক্ষণ বিচরণের পর ভূমিতে উপবেশন করলেন এবং গান্ধারী ও দুর্বাসার শাপের বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন। অনন্তর তাঁর প্রয়াণকাল আগত হয়েছে এই বিবেচনায় তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযম এবং মহাযোগ আশ্রয় ক'রে শয়ান হলেন। সেই সময়ে জরা নামে এক ব্যাধ মৃগ মনে ক'রে তাঁর পদতল শরবিদ্ধ করল। তার পর সে নিকটে এসে যোগমগ্ন পীতাম্বর চতুর্ভুজ কৃষ্ণকে দেখে ভয়ে তাঁর চরণে পতিত হ'ল। মহাত্মা কৃষ্ণ ব্যাধকে আশ্বাস দিলেন এবং নিজ কান্তি দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত ক'রে ঊর্দ্ধে স্বকীয় লোকে প্রয়াণ করলেন।…'*

শুধু আমি নই, আমার সহযাত্রীরা সবাই অপলক নয়নে তাকিয়ে রয়েছেন এই পরম-পবিত্র ক্ষেত্রের দিকে। আমি এগিয়ে এসে একেবারে বেদির কোল ঘেঁষে দাঁড়াই। আনত হয়ে মাথা ঠেকাই মাটির সঙ্গে। তারপরে অশ্বত্থের পাদদেশ থেকে একমুঠো ধূলি তুলে মাথায় মাখি। মনে মনে বলি—মথুরায় তোমার জন্মভূমির রজঃ অঙ্গে মেখেছিলাম, আজ তোমার প্রয়াণতীর্থ প্রভাসের পরাগও দেহে ধারণ করলাম। আমি ধন্য হলাম, আমার জীবন কৃতার্থ হল। হে নরনারায়ণ! তুমি আমার সহায় হও। আমাকে আশীর্বাদ করো—আমি যেন তোমার মহাজীবনের মাঝে ভারত-আত্মার সন্ধান পাই।

আবার টাঙ্গার শোভাযাত্রা শুরু হয়েছে। আমরা এখন সোমনাথে চলেছি।

বর্তমান প্রভাস ও সোমনাথে সব মিলিয়ে আটানব্বুইটি দর্শন।

---

* মহাভারত—(সারানুবাদ) রাজশেখর বসু

তার মধ্যে আমরা মোটে গুটিবারো দেখেছি। বিকেল হয়ে গিয়েছে। আজ রাতের ট্রেনেই বিদায় নেব প্রভাসের কাছ থেকে। সুতরাং সব তীর্থ দর্শন করা হয়ে উঠবে না আমাদের।

সেকালে নাকি এখানে আরও বেশি দর্শন ছিল। প্রভাসখণ্ডের (স্কন্দপুরাণের সপ্তম খণ্ড) প্রথম ৩৬৫টি অধ্যায়ে প্রভাসের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। এই বিবরণ থেকে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে প্রভাস ও সোমনাথে ১৩৫টি শিবমন্দির, ২৫টি দেবীমন্দির, ১৬টি সূর্যমন্দির, ৫টি করে বিষ্ণু ও গণপতির মন্দির এবং ১টি করে নাগ ও ক্ষেত্রপালের মন্দির অর্থাৎ মোট ১৮৮টি মন্দির ছিল। ছিল ১৯টি কুণ্ড, ৮টি তীর্থ, ৪টি বিবর, ৩টি ক্ষেত্র, ২টি বন, ১টি করে অরণ্য আশ্রম ও শ্মশান। আর ছিল ৯টি নদী ও ৫টি কুয়ো — তার দুটিতে সিঁড়ি বেয়ে ভেতরে নামা যেত। সবচেয়ে বিস্ময়কর শত শত বছরের ধ্বংসলীলার পরেও তার কয়েকটি মন্দির এবং স্থান আজও পুণ্যার্থীদের পরম-সম্পদ রূপে বিরাজ করছে।

সোমনাথে পাওয়া শিলালিপি থেকে জানা গিয়েছে যে ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দের ধ্বংসলীলার অনতিকাল পরেই প্রভাসে আবার একুশটি মন্দির মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল।

সুলতান মাহমুদ চলে যাবার পরেই গুজরাতের রাজা ভীমদেও সোলাঙ্কি, মালবের রাজা ভোজরাজ পারমার, আজমীরের রাজা বিশালদেও চৌহান এবং জুনাগড়ের রাজা রা'নবঘন যৌথভাবে বিধ্বস্ত মন্দির সারিয়ে আবার লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল তীর্থযাত্রা। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজা-মহারাজারা এসে আবার সোমনাথকে সমৃদ্ধ করতে থাকলেন।

১১৪৩ থেকে ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে গুজরাতের রাজা কুমারপাল প্রাচীন মন্দিরের আমূল সংস্কার সাধন করে একটি নতুন মন্দির নির্মাণ করলেন। অনেকে বলেন 'সিদ্ধহেম' ও 'অভিধান-চিন্তামণি' রচয়িতা প্রখ্যাত জৈন-পণ্ডিত হেমচন্দ্রাচার্যের পরামর্শে তিনি এই মন্দির নির্মাণ করেন। আবার অনেকের মতে তাঁর শিক্ষা-

গুরু ও মন্ত্রী ভব বৃহস্পতি নির্দেশে তিনি এটি তৈরি করেছিলেন। যাই হোক মন্দির নির্মিত হবার পরে ভব বৃহস্পতি প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করে শহরকে সম্প্রসারিত করলেন। অনেক নতুন বাড়ি তৈরি করে সেগুলো ব্রাহ্মণদের দান করা হল।

১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতের রাজা দ্বিতীয় ভীমদেও ধর্মাদিত্য-সূর্য মন্দিরটির সংস্কার সাধন করে ভীমেশ্বর ও লীলেশ্বর মন্দির দুটি তৈরি করে দিলেন। সুবিখ্যাত দিলওয়ারা (মাউন্ট-আবু) মন্দিরের নির্মাতা জৈনভক্ত বাস্তুপাল ও তেজপাল (খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী) সোমনাথে এসে অষ্টাদশপ্রসাদ মন্দির নির্মাণ করেন।

এইভাবে মাহ্‌মুদের তাণ্ডবলীলার দেড়শ' বছরের মধ্যে প্রভাস আবার এক সমৃদ্ধ মহানগরীতে পরিণত হয় এবং সোমনাথ আগের মতোই ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠেন।

কথাটা কানে গেল আলা-উদ্-দিনের — দিল্লীর সুলতান আলা-উদ্-দিন খিলজীর (১২৯৬-১৩১৬ খ্রীঃ)। তিনি তখন বোধহয় পদ্মিনীকে পাবার নেশায় মশগুল, চিতোর জয়ের (১৩০৩ খ্রীঃ) পরিকল্পনায় ব্যস্ত। তাঁর অনেক টাকা-পয়সার দরকার। কাজেই শক্তিশালী এক সেনাবাহিনী দিয়ে ভাই উলঘ্ খানকে গুজরাতে পাঠিয়ে দিলেন। পথের সমস্ত হিন্দুরাজ্যে লুণ্ঠন ধর্ষণ ও হত্যার তাণ্ডব চালিয়ে উলঘ্ ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রভাসে পৌঁছল। স্থানীয় রাজা ও প্রভাসের মানুষ তাকে যথাসাধ্য বাধা দিলেন, কিন্তু তাঁরা দিল্লীর বাহিনীকে রুখতে পারলেন না।

মাহ্‌মুদের মতোই উলঘ্ প্রথমে সোমনাথের লিঙ্গমূর্তি সহ সমস্ত মন্দিরের সব বিগ্রহ চূর্ণ করল। তারপরে একইভাবে চলল লুণ্ঠন ধর্ষণ ও হত্যা। যাবার সময় সে-ও শত শত যুবক-যুবতীকে বন্দী করে নিয়ে গেল। আলা-উদ্-দিনের সুযোগ্য সেনাপতি আরও একটি কাজ করেছিল। সে সোমনাথে বসে হাজার হাজার হিন্দুকে জোর করে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেছিল, খসরু তাঁদেরই একজন। তিনি

১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে আলা-উদ্‌-দিনের ছেলে কুতুব-উদ্‌-দিন মুবারককে হত্যা করে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন। চার মাস পরে তাঁকে হত্যা করে গিয়াস-উদ্‌-দিন তুঘলক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। যাই হোক, উলঘ্‌ প্রভাসকে দ্বিতীয়বার শ্মশানে পরিণত করে দিল্লী ফিরে গেল।

মাহ্‌মুদ যা পারেন নি, আলা-উদ্‌-দিনও তা পারলেন না। তাঁর সেনাবাহিনীতে অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে জুনাগড়ের রাজা চতুর্থ রা'নবঘন প্রভাস থেকে সুলতানের সৈন্যদের তাড়িয়ে দিলেন এবং খুব তাড়াতাড়ি বিধ্বস্ত মন্দির সরিয়ে ১৩০৮ সালে সোমনাথের লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

এবারে গিয়াস-উদ্‌-দিন (১৩২০-১৩২৫ খ্রীঃ)। শুনেছি তিনি নাকি খুবই বিদ্যোৎসাহী ধার্মিক ছিলেন। তাই হয়তো তিনিও সোমনাথকে সইতে পারলেন না। তবে তিনি আর কষ্ট করে সোমনাথ পর্যন্ত এলেন না। ১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জুনাগড় দুর্গ অধিকার করে তাঁর সৈন্যদের প্রভাসে পাঠিয়ে দিলেন। তারা যথারীতি আবার সোমনাথ মন্দির বিধ্বস্ত করে লিঙ্গমূর্তি চূর্ণ করল।

ভক্তরা কিন্তু বেশিদিন সোমনাথের অদর্শন সইতে পারলেন না। জুনাগড়ের রাজা তৃতীয় রা'খেংগারের সক্রিয় সহযোগীতায় প্রভাসের রাজা মেঘরাজ ভজো সুলতানের সৈন্যদের প্রভাস থেকে বিতাড়িত করলেন। তারপরে নতুন লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সোমনাথের প্রকাশ্য পূজার প্রচলন করলেন।

একজন সামান্য সামন্তরাজার এই ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করলেন না তৎকালীন দিল্লীর সুলতান ফিরোজ। তিনি গুজরাতের শাসক জাফর খানকে জুনাগড় ও সোমনাথ ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন। ১৩৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সোমনাথ চতুর্থবার বিনষ্ট হল। মেঘরাজ শহীদ হলেন।

দশ বছর বাদে মালিক মুফারাহ্‌ গুজরাতের নতুন শাসক নিযুক্ত হলেন। তিনি স্বাধীন গুজরাতের স্বপ্ন দেখছিলেন। সুতরাং হিন্দুদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করলেন। মেঘরাজের ভাই ভার্মা তখন

প্রভাসের রাজা। বুদ্ধিমান রাজা এই সুযোগে সোমনাথে লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে নিলেন। তিনি প্রভাস দুর্গটিরও সংস্কার সাধন করেছিলেন।

১৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভক্তরা নির্বিঘ্নে সোমনাথের সেবা-পূজা করতে পেরেছেন। তারপরেই মালিককে হত্যা করে আরেক জাফর খান গুজরাতের শাসক হলেন। এই জাফর ছিলেন জনৈক ধর্মান্তরিত রাজপুতের পুত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা তিনি সোমনাথের ওপর সবচেয়ে বেশিবার আঘাত হেনেছেন। ১৩৯৫, ১৪০২ ও ১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সোমনাথ মন্দির বিধ্বস্ত করে লিঙ্গমূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছেন। বলা বাহুল্য ভক্তরা বার বার মন্দির মেরামত করে লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন বলেই, জাফরকেও বার বার প্রভাসে আসতে হয়েছে।

কিন্তু জাফরের জীবদ্দশায় ভক্তরা আর মন্দির সংস্কার করেন নি। জাফরের মৃত্যুর পরে তাঁর পৌত্র আহমেদশাহ গুজরাতের সুলতান হন। তিনি ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রভাসে আসেন। তখন ভগ্ন সোমনাথ মন্দিরে কোন লিঙ্গমূর্তি ছিল না। তবু আহমেদশাহ পিতামহের 'ট্রাডিশন্' বজায় রাখলেন। প্রভাস ও সোমনাথের অভগ্ন এবং অর্ধ-ভগ্ন সমস্ত মন্দিরগুলি তিনি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেললেন। অসংখ্য নিরপরাধ অমুসলমানকে হত্যা করে প্রভাসের পথে পথে রক্তের বন্যা বইয়ে দিলেন। তিনি প্রভাসে ইসলামী আইন বলবত করলেন।

আহমেদশাহের সুযোগ্য প্রতিনিধিরা তারপরে বেশ কয়েক বছর ধরে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রভাসে ধর্মান্তকরণ ও ধ্বংসলীলা চালিয়ে গেল। তারা বহু মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করল এবং হাজার হাজার হিন্দু ও জৈনকে জোর করে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা দিল।

এই অকথ্য অত্যাচার সত্ত্বেও কিন্তু জুনাগড়ের রাজা তৃতীয় রা'মাণ্ডলিক ১৪৫১ থেকে ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সোমনাথের মন্দির মেরামত করে লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। এই অষ্টম মূর্তি বছর পঁচিশেক পুজো পেয়েছেন। ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন গুজরাতের যাযাবর সুলতান মহম্মদ বেগড়া সসৈন্যে

সোমনাথে এসে সেই মূর্তি সহ সমস্ত মন্দির ধ্বংস করে ফেলেন।

এই সময় হমীরজী গোহিল নামে জনৈক শৌর্যময় রাজপুত্র সোমনাথকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর শ্বশুর বেগড়া ভীলও তাঁর সঙ্গে শহীদ হয়েছেন। তাঁদের সেই মহান আত্মত্যাগ আজও গুজরাতে লোকগীতি হয়ে আছে। আর সোমনাথে রয়েছে তাঁদের স্মৃতিমন্দির। আমরা দর্শন করব।

আহমেদশাহের প্রতিনিধিদের মতোই মহম্মদের প্রতিনিধিরাও তারপরে প্রভাসে দীর্ঘকাল ধর্মান্ধকরণ ও ধ্বংসলীলা চালিয়ে গেল। ফলে সোমনাথে আর লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ভক্তরা তখন নিয়মিত সরস্বতী নদীর তীরে সমবেত হয়ে সোমনাথের পূজো করতেন। আর প্রভাসের বাতাস শাসকদের দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে উঠত। কারণ সরস্বতীকে যেমন ভাঙা যায় না, তেমনি সঙ্গে করেও নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি তাদের পক্ষে।

১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রভাসের ভাগ্যাকাশে আবার দুর্যোগ ঘনিয়ে এলো। এবারে কিন্তু কোন সুলতান কিংবা সম্রাট নয়। পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতি ডি' কাস্ট্রো গুজরাতের সুলতানী নৌবাহিনীকে পরাস্ত করে প্রভাস ও ভেরাভলে আগুন লাগিয়ে দিয়ে লুণ্ঠন ধর্ষণ ও ধ্বংস-লীলার এক নতুন নজীর স্থাপন করলেন। তিনি হত্যার সময়ে হিন্দু-মুসলমান বিচার করলেন না। মন্দির ও মসজিদ দুই-ই তাঁর সৈন্যদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হল। তারা হিন্দু যুবতীদের মতো মুসলমান মেয়েদের ওপরেও বলাৎকার করল।

প্রভাসের পরধর্মদ্বেষীরা প্রথম ধর্মান্ধতার কুফল উপলব্ধি করার সুযোগ পেল। ডি' কাস্ট্রো সেবারে প্রভাস থেকে ধন-রত্ন ও নর-নারীর সঙ্গে ত্রিপুরান্তক প্রশস্তি নামে একখানি মূল্যবান শিলালিপি নিয়ে গিয়েছিলেন। সেটি এখনও পর্তুগালে রয়েছে।

অপদার্থ সুলতানের একজন উজীর সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ) কাছে গুজরাত রক্ষা করায় আবেদন জানালেন। বিচক্ষণ সম্রাট এ সুযোগ হারালেন না। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজে আমেদাবাদে

অধিকার করে সুলতানকে বন্দী করলেন। গুজরাত অধিকার করার সময় আকবর তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে এগারো দিনে ছ'শ মাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ স্মিথ্ আকবরের গুজরাত জয় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন 'The conquest of Gujrat marks an important epoch in Akbar's history.' *

আকবরের গুজরাত বিজয় সোমনাথের ইতিহাসেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিন শ' বছর পরে প্রভাসের ধর্মপ্রাণ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ১৫৮১ সালে নবম লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল।

১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের প্রতিনিধি মির্জা আজিজ কোকা প্রভাস পরিদর্শনে এলেন। তিনি হিন্দুদের আশ্বাস দিলেন — সম্রাট অপরের ধর্মাচরণে বাধা দেবার পক্ষপাতী নন। তিনি হিন্দুদের ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত করবেন না। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ভক্তরা সোমনাথ মন্দিরে মহাসমারোহে মহারুদ্র যজ্ঞ সুসম্পন্ন করলেন।

তারপরে প্রায় সত্তর বছর ধরে সোমনাথের মন্দিরে প্রতি প্রত্যুষে মঙ্গলারতির ঘণ্টা বেজেছে, সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বলেছে। জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানও আকবরের মতোই সোমনাথের দিকে নজর দেন নি, স্থানীয় মুসলমান শাসকরাও সোমনাথকে কলঙ্কিত করার সাহস পায় নি। কিন্তু সিংহাসনে বসার বছর সাতেক পরেই আওরঙ্গজেব আদেশ জারি করলেন — কাফেরদের মূর্তিপূজা বন্ধ কর। হিন্দুদের সমস্ত মন্দির ও মঠ ভেঙে ফেলো। দেখো, সোমনাথের মন্দির যেন বাদ না যায়। ওটাই কাফেরদের সবচেয়ে বড় আড্ডা।

১৬৬৫ সালে নিষ্ঠুর ও ধর্মান্ধ আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) কালো থাবা পড়ল সোমনাথের ওপরে। জনৈক ঐতিহাসিকের ভাষায় — "He (Aurangzeb) directed his officers to destroy the temple in 'such perfect a manner that it

* 'Oxford History of India' by V. A. Smith.

would never rise again.' He further ordered them to expel all those who worshipped idols."*

স্থানীয় হিন্দুদের সকল বাধা জয় করে আওরঙ্গজেবের সৈন্যরা প্রভাসের ওপরে চরম আঘাত হানল। সত্যই তারা 'পারফেক্ট ম্যানার'-য়ে সোমনাথ ও অন্যান্য মন্দির ধ্বংস করল। এত আক্রমণের পরেও সোমনাথ মন্দিরের যে শিখরটি এতকাল অক্ষত ছিল, তারা সেটিকে পর্যন্ত ভেঙে ফেলল। ফলে পাঁচ শ' বছরের ঐতিহ্যের অবসান ঘটল। দ্বাদশ শতাব্দীতে মহারাজা কুমারপাল নির্মিত সোমনাথের পঞ্চম মন্দিরটিকে আওরঙ্গজেব চিরকালের মতো অব্যবহার্য করে তুললেন। নবমবার সোমনাথের লিঙ্গমূর্তি বিনষ্ট হল।

তারপরে প্রায় একশ' বছর সোমনাথ মন্দিরে সোমনাথের পূজো হয় নি। তার মানে অবশ্য এ নয় যে সোমনাথ পূজা পান নি। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বিষ্ণুশর্মা (চাণক্য) কর্তৃক প্রভাসে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত, প্রায় এই আড়াই হাজার বছর ধরে, একটি দিনের জন্যও সোমনাথের সেবাপূজা বন্ধ হয় নি।

আওরঙ্গজেবের ধ্বংসলীলা পরে তাই সোমনাথের সেবকরা প্রভাসের শশিভূষণ মন্দিরের লিঙ্গমূর্তিতে প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানেই একশ' বছর ধরে সোমনাথের সেবা-পূজা চলে। তারপরে অহল্যাবাঈ···ইন্দোরের ধর্মাপ্রাণা মহারাণী অহল্যাবাঈ।

মনে মনে তাঁরই কথা ভেবে চলি। তিনি আহমদ্‌নগরের মেয়ে। তাঁর বাবার নাম আনন্দ রাও সিন্ধিয়া। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোরের যুবরাজ খণ্ডে রাও হোলকারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। স্বামী এবং একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যুর জন্য ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকেই ইন্দোরের সিংহাসনে বসতে হয়। বলাবাহুল্য, সে সিংহাসন নিষ্কণ্টক ছিল না। কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধি ও সাহসের সাহায্যে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই ইন্দোরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

---

* 'Prabhas and Somnath' by S. H. Desai.

সমসাময়িক ঐতিহাসিক স্যার জন ম্যাল্‌কম লিখে গিয়েছেন— অহল্যাবাঈ সরল জীবনযাপন করতেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমী ও সুশাসক ছিলেন। যেমন ছিলেন দয়ালু, তেমনি কঠোর। শান্তিরক্ষার জন্য একবার তিনি বহু ভীলসর্দারকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন।

ধর্মপ্রাণা অহল্যাবাঈ সারা ভারতে বহু বিধ্বস্ত মন্দিরের সংস্কার-সাধন করেন। তিনি অসংখ্য ধর্মশালা ও তীর্থপথ তৈরি করে দিয়েছেন। নর্মদাতীরে মহেশ্বর ছিল তাঁর প্রিয়তম স্থান। পূবে পুরী, পশ্চিমে দ্বারকা ও প্রভাস, উত্তরে কেদার-বদ্রী ও দক্ষিণে রামেশ্বর পর্যন্ত আসমুদ্র হিমাচলের প্রায় প্রতিটি প্রধান তীর্থে অহল্যাবাঈ কিছু-না-কিছু কীর্তি রেখে গিয়েছেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সত্তর বছর বয়সে এই ধর্মপ্রাণা মহারাণী মহাপ্রয়াণ লাভ করেন।

প্রাতঃস্মরণীয় অহল্যাবাঈ ভারতের বিভিন্ন বিধ্বস্ত মন্দিরের সঙ্গে সোমনাথ মন্দির সংস্কার-সাধনের জন্যও নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কাজে নেমে দেখা গেল আওরঙ্গজেবের সৈন্যরা এতই নিখুঁতভাবে সম্রাটের আদেশ পালন করেছে যে প্রাচীন মন্দিরের আর সংস্কার-সাধন সম্ভব নয়। সুতরাং অহল্যাবাঈকে বাধ্য হয়ে প্রাচীন মন্দিরের কাছেই একটি নতুন মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা অনুমোদন করতে হল।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সেই নতুন সোমনাথ মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ হল। শেষ হতে পাঁচ বছর সময় লাগল।

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের এক শুভদিনে সেই নতুন মন্দিরে মহাসমারোহে সোমনাথের জ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত যে কাজ শুরু করেছিলেন, আড়াই হাজার বছর পরে মহারাণী অহল্যাবাঈ তা শেষ করলেন। একটি মাত্র মন্দিরকে কেন্দ্র করে এমন স্বর্গীয় আত্মত্যাগ এবং এত নারকীয় স্বার্থপরতার নজীর আর নেই মানুষের ইতিহাসে। সোমনাথের ইতিহাস শুধু শাশ্বত ভারতের ইতিহাস নয়, বিশ্বইতিহাসে আদর্শ ও নিষ্ঠার মহত্তম অধ্যায়।

সোমনাথ মন্দির আজও আছে, চিরকাল থাকবে। প্রভাস

দর্শনের পরে আমরা এখন সেই চিরকালের সোমনাথ মন্দির দর্শন করতে চলেছি।

॥ আট ॥

'জয় প্রভাস, জয় সোমনাথ। জয়…'

যাঁর কথা ভাবছি, তাঁরই জয়ধ্বনিতে ভাবনা থেমে যায়। আমি বাস্তবে ফিরে আসি। সামনে তাকাই।

হ্যাঁ, ঐতো সামনে, সামান্য দূরে বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন সোমনাথ — সোমনাথের নবনির্মিত মন্দির।

যে মন্দিরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার জন্য দানবীয় শক্তির পাশব উল্লাসে বার বার কেঁপে উঠেছেন বসুন্ধরা, সেই মন্দির আরও সুন্দর আরও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে আমার সামনে। অগণিত ভক্ত-বৃন্দের জয়ধ্বনিতে আজও সে তেমনি মুখরিত।

আমরাও সোমনাথের জয়ধ্বনি করে নেমে পড়ি টাঙ্গা থেকে। নতুন মন্দিরে পরে যাবো, আগে পুরণো মন্দির দর্শন করে নিই — রানী অহল্যাবাঈ নির্মিত সোমনাথ মন্দির। তারই সামনে এসে টাঙ্গা থেমেছে।

চারিদিকে দেওয়াল। একতলা মন্দির। ছাদে রেলিং দেওয়া। শ্বেতপাথরের গোলাকার শিখর। 'ওঁ' লেখা গৈরিক কাপড়ের পতাকা উড়ছে।

একপাশে মন্দির তোরণ। সামনে হিন্দী ও ইংরেজীতে লেখা —

'Temple of Somnath

Built by Rani Ahalyabai in A. D. 1783

Old Monument protected by Shri Somnath Trust.'

১১৯০ বঙ্গাব্দের বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়াতে এই মন্দির নির্মাণ আরম্ভ হয়েছিল। ১১৯৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় দুই শতাব্দী ধরে লিঙ্গমূর্তি অক্ষত রয়েছেন।

ছোট হলেও খুবই মজবুত মন্দির। তোরণের বাঁদিকে মূল-মন্দির, ডানদিকে একফালি বাঁধানো অঙ্গন। অঙ্গনের শেষে গণপতি, অন্নপূর্ণা ও কাশী-বিশ্বনাথের মন্দির। আমরা দর্শন করি।

মন্দির এলাকার ভেতরেই একটি ছোট ও একটি মাঝারী দোতলা বাড়ি রয়েছে। পাণ্ডাজী বলেন, "এর একটা সেবাইতদের বাসগৃহ, আরেকটি সংস্কৃত টোল। কিছুক্ষণ আগে এলেই ছাত্র-ছাত্রীদের দেখতে পেতেন।"

আমরা অঙ্গন থেকে বারান্দায় উঠে আসি। বারান্দার পরেই গর্ভ-মন্দির। ঠিক কেন্দ্রস্থলে লিঙ্গমূর্তি। ভারতের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রথম এই সোমনাথ। বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্যের মতে অপর এগারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ হল—শ্রীশৈলর মল্লিকার্জুন, উজ্জয়িনীর মহাকাল, নর্মদাতীরের অমরেশ্বরে ওঙ্কারনাথ, গাড়োয়ালের কেদারনাথ, ডাকিনীর ভীমশঙ্কর, বারাণসীর বিশ্বেশ্বর, নাসিকের ত্র্যম্বক, দেওঘরে (অনেকের মতে পাঞ্জাবে) বৈদ্যনাথ, দ্বারকায় নাগেশ, সেতুবন্ধে রামেশ্বর এবং শিবালয়ে ঘৃষ্ণেশ্বর।

এই সেই প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ। আড়াই হাজার বছর ধরে কোটি কোটি ভক্ত যাঁকে একবার দর্শন করবার জন্য প্রাণ তুচ্ছ করে ছুটে এসেছেন, যাঁর জন্য যুগে যুগে হাজার হাজার মানুষ হাসতে হাসতে জীবন দিয়েছেন, তাঁরই সামনে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। আবেগ ও উত্তেজনায় কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছি। আমি পুজোর কথা ভুলে গেছি, ভুলে গিয়েছি প্রণাম করতে। শুধু সোমনাথের দিকে তাকিয়ে রয়েছি অপলক নয়নে।

সহসা পাশ থেকে পাণ্ডাজী বলে ওঠেন, "ইনি কিন্তু সোমনাথ নন।"

চমকে উঠি। পাণ্ডাজীর দিকে তাকাই। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি, "তাহলে?"

"ইনি অহল্যেশ্বর। সোমনাথ রয়েছেন নিচের মন্দিরে। প্রণাম করে চলুন সেখানে।"

আগ্রহের আতিশয্যে কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। মহারানী অহল্যাবাঈ যখন এ-মন্দির নির্মাণ করেন, তখন পলাশীর যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, দিল্লীতে মুসলমান রাজত্বের নাভিশ্বাস উঠেছে, কিন্তু হিন্দু মন্দিরের বিগ্রহ নিরাপদ হন নি। সোমনাথের নিরাপত্তা আসে নি পরবর্তী পৌনে দু'শ বছরে। এমন কি ভারত স্বাধীন হবার পরেও জুনাগড়ের নবাবের প্ররোচনায় প্রভাসে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা বলবৎ হয়েছিল।

তাই মহারানীকে কিঞ্চিৎ ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। মাটির ওপরে লোক-দেখানো মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক লিঙ্গমূর্তি। আমরা এখন তাঁকেই বলছি অহল্যেশ্বর।

অহল্যাবাঈ আসল মন্দির নির্মাণ করেছেন মাটির নিচে। সেখানেই বিরাজ করছেন আমাদের সেই পরম বাঞ্ছিত দেবাদিদেব — চিরমঙ্গলময় সোমনাথ।

বারান্দার বাঁদিকে একটি ছোট দরজা। সেটি পেরিয়ে আমরা মন্দিরের পাশে আসি। এক সারি সিঁড়ি নেমে গিয়েছে নিচে। না, মোটেই সংকীর্ণ নয়। মিসেস উকিল নামতে পারবেন কষ্ট করে, একটু ধরতে হবে — এই যা। তা সেজন্য তো পাণ্ডাজী, ম্যানেজার ও বাণেশ্বর রয়েছেই।

রয়েছেন উকিলবাবুও, তবে তিনি যথারীতি টাঙ্গায় বসে আছেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে, সেই একই উত্তর দিয়ে চলেছেন — সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য, নহিলে ঝামেলা বাড়ে।"

বাইশ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি নিচে। এ-যেন আরেক জগৎ। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত শ্বেতপাথরের ঝকঝকে মন্দির। মাটির নিচে হলেও মোটেই গুমোট নয়, বেশ হাওয়া খেলছে।

সিঁড়ির শেষে দরজা — রুপোর পাতে মোড়া মজবুত দরজা, এটি মন্দিরের উত্তর দিক। আমরা দরজা পেরিয়ে ভেতরে আসি।

ছাদ থেকে ঘণ্টা ঝুলছে। সামন্তবাবুর দুই কিশোর পুত্র এবং

বিউটি ঘণ্টা বাজায়। ঠাকুরমারাও তাদের সঙ্গী হলেন। প্রভাসের মানুষের কাছে এই ঘণ্টাধ্বনিটি বড়ই মধুর, বড়ই প্রিয়। আমারও ভাল লাগছে। আমিও ঘণ্টার দিকে হাত বাড়াই।

মন্দিরের পুবদিকে শ্বেতপাথরের নন্দীমূর্তি। পশ্চিমে কষ্টিপাথরের অপরূপা পার্বতী — যেন স্বয়ং জগজ্জননী দণ্ডায়মানা। দক্ষিণে লক্ষ্মী, গঙ্গা ও সরস্বতীর স্নিগ্ধা মূর্তি। আর মাঝখানে···

ঠিক কেন্দ্রস্থলে শ্বেতপাথরের সুদৃশ্য ও সুপ্রশস্ত বেদির ওপরে সোমনাথ — ভারতের প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ। এই মন-মন্দিরে তিনি সোমনাথ রূপে বিরাজ করছেন।

এমন মসৃণ, এত স্নিগ্ধ ও সুন্দর শিবলিঙ্গ আমি এর আগে কোথাও দেখি নি। একটি রুপোর সাপ তাঁকে চারবার পাক খেয়ে মাথার ওপরে ফণা ধরে আছে।

আমি প্রণাম করি। প্রণাম করি সর্বমঙ্গলময় সোমনাথকে। প্রণাম করি প্রাতঃস্মরণীয়া রানী অহল্যাবাঈকে। প্রণাম করি শত-সহস্র শহীদের মৃত্যুহীন প্রাণকে। তোমরা আমাদের আশীর্বাদ কর — আমরা যেন তোমাদের জ্বালিয়ে যাওয়া সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার প্রদীপটিকে অনির্বাণ রাখতে পারি। হে বীরবৃন্দ! তোমরা আমাদের সকৃতজ্ঞ চিত্তের সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ কর।

অঘোরেশ্বর ও ভৈরবেশ্বরকে দর্শন করে বেরিয়ে আসি অহল্যাবাঈ মন্দির থেকে। সামনে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর। তার একপাশে এই পুরণো মন্দির, আরেকপাশে সাগরতীরে নতুন মন্দির। আমরা এখন ওখানেই চলেছি।

সামান্য দূর, তাই আর টাঙ্গায় উঠি নি, হেঁটেই চলেছি। তাছাড়া এটি তো কোন সাধারণ প্রান্তর নয়, শত-সহস্র শহীদের রক্তে রাঙা মুক্তিতীর্থ। এখানে দু-দণ্ড দাঁড়াতে পারা পরম সৌভাগ্যের।

প্রান্তরের দুই প্রান্তে দুটি মন্দির। বাঁয়ে ও সামনে সীমাহীন সাগর, ডাইনে ও পেছনে শহর।

প্রান্তরের শেষপ্রান্তে, নতুন মন্দিরের সামনে চমৎকার একটি

গোলাকার বাগান। তারই মাঝে শ্বেতপাথরের সুউচ্চ বেদির ওপরে বল্লভভাই প্যাটেলের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি — বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা চলা বন্ধ করি। সর্দারজীর চারিপাশে সারিবেঁধে দাঁড়াই।

প্রতিমূর্তির বেদির ওপরে লেখা রয়েছে —

'Vikramaditya
The Architect and Welder of Bharat
Strong and Great
The Rebuilder and Restorer
of
SOMNATH
The Shrine Eternal
SARDAR BALLAVBHAI PATEL
31st October, 1875 — 15th December, 1950'

আমরা তাঁকে স্মরণ করি।

ভারত স্বাধীন হবার পরে সর্দারজী মাত্র সোয়া তিন বছর বেঁচেছিলেন। তারই মধ্যে তিনি 'খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত' ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষতার সুমধুর বন্ধনে বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর মতো কোমল ও কঠিন মানুষ সেদিন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী না হলে, হয়তো আজ আমার আসা হত না এই সোমনাথে, দেখা হত না পুণ্যতীর্থ-প্রভাস। হয়তো আমার জন্মভূমির মতো সেও আমার কাছে চিরদিনের জন্য বিদেশ হয়ে যেতো।

ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত ভারতে ছ'শ'র মতো দেশীয় রাজ্য ছিল, তাদের মধ্যে দু'শ' আঠারটি ছিল শুধু এই সৌরাষ্ট্রে। ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলির জনসংখ্যা ছিল প্রায় দশ কোটি।

স্বাধীনতা হস্তান্তরিত করবার আগে বৃটিশ সরকার বললেন — ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশীয় রাজ্যগুলো আইনসঙ্গতভাবে স্বাধীন হয়ে যাবে। রাজন্যবর্গ তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী ভারত অথবা পাকিস্তানের

সঙ্গে যোগ দিতে কিংবা স্বাধীন থাকতে পারবেন।

অনিচ্ছায় হলেও তিনজন রাজা ও নবাব ছাড়া আর সকলেই ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগদান করলেন। কেবল যোগ দিলেন না—কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং, হায়দারাবাদের নিজাম উসমান আলি খাঁ ও জুনাগড়ের নবাব মহব্বৎ খাঁ। রসুলখাঁন। কাশ্মীর ও হায়দারাবাদের কথা থাক্, জুনাগড়ের কথাই ভাবা যাক্।

জুনাগড় ছিল চৌদসামা বংশীয় রাজপুতদের রাজ্য। ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতের সুলতান মহম্মদ বেগড়া জুনাগড় অধিকার করেন। সম্রাট আকবরের গুজরাত জয়ের (১৫৭৩ খ্রীঃ) পরে জুনাগড় মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আওরঙ্গজেবের বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জুনাগড়ের মোগল শাসক শেরখাঁ বাবি ১৭২৭ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। তাঁরই বংশের শেষ নবাব এই মহব্বৎ খাঁ।

নবাবের প্রধান শখ ছিল কুকুর ও শিকার। তাঁর দেড়শ' কুকুর ছিল। প্রত্যেকটির জন্য ছিল পৃথক পরিচালক, শোবার ঘর ও টয়লেট, ডাইনিং টেবল ও খাট-বিছানা। কুকুরের বিয়েতে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতেন।

কিন্তু তিনি খেয়ালী হলেও নির্বোধ ছিলেন না। লর্ড মাউন্টব্যাটন, জাতীয় কংগ্রেস ও কাথিওয়াড়ের রাজন্যবর্গকে ফাঁকি দিয়ে তিনি ১৯৪৭ সালের গোড়া থেকেই জিন্নাসাহেবের সঙ্গে শলাপরামর্শ শুরু করে দিয়েছিলেন।

জিন্না জানতেন জুনাগড়ে শতকরা আশিজন অমুসলমান। এবং রাজ্যের চারিপাশেই ভারত। জলপথে করাচী থেকে ভেরাভল প্রায় সাড়ে তিনশ' মাইল। তবু তিনি মহব্বৎকে মদত দিতে থাকলেন। কারণ তিনি জুনাগড়কে দাবার খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু অধ্যুষিত রাজ্যের মুসলমান নবাব পাকিস্তানে যোগ দিলে যদি ভারত আপত্তি করে, তাহলে মুসলমান অধ্যুষিত কাশ্মীরের হিন্দুরাজাও ভারতে যোগদান করতে পারবেন না। আর ভারত যদি কাশ্মীরের স্বার্থে জুনাগড়ের পাকিস্তানভুক্তি মেনে নেয়,

তাহলে হায়দারাবাদের নিজামও পাকিস্তানে যোগ দিতে পারবেন। তাই করাচী মুসলিম লীগের প্রথম সারির নেতা স্যার শাহনওয়াজ ভুট্টোকে তিনি জুনাগড়ে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই নবাব তাঁকে দেওয়ানের পদে অভিষিক্ত করলেন।

রাজ্যের জনসাধারণ, বৃটিশ ও ভারত সরকারকে বিস্মিত করে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট এক প্রেসনোটের মাধ্যমে জুনাগড় সরকার তথা নবাব পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি কথা ঘোষণা করলেন। প্রেসনোটে বলা হল — '…After anxious consideration and the careful balancing of the factors, Govt. of the state has decided to accede to Pakistan and hereby announces its decision to that effect'. *

১৩ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তান এই অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন করলেন।

ভারত সরকার সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারলেন না। কারণ জুনাগড় শুধু হিন্দু অধ্যুষিত নয়, হিন্দু ও জৈনদের পরম পবিত্র তীর্থ প্রভাস ও গির্ণার জুনাগড় রাজ্যে অবস্থিত। তার ওপরে জুনাগড় পাকিস্তানের মাটি হলে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। তবু ভারত সরকার ধৈর্য ধারণ করলেন।

কিন্তু ধৈর্য ধরলেন না নবাব। তার চেলা-চামুণ্ডারা ও পাইক-বরকন্দাজের দল অকারণে অমুসলমানদের ওপর চড়াও হল। মন্দির মঠ ও গির্জা কলুষিত হল। লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও হত্যার তাণ্ডব শুরু হল সারা রাজ্যে। সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়েও হিন্দুরা ব্যাপকভাবে বাস্তুত্যাগ আরম্ভ করলেন। তাঁরা সর্বস্বান্ত হয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে থাকলেন।

নবনগরের জামসাহেব দিগ্বিজয়সিংজী ছুটে গেলেন দিল্লীতে। তিনি ভারত সরকারকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন — জুনাগড়ে হিন্দুদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চলেছে। ভারত সরকার এখনও যদি এর একটা বিহিত না করে, তাহলে সারা কাথিওয়াড়ে মুসলমান নিধন শুরু হয়ে যেতে পারে।

* 'রাজা গেল রাজ্য গেল'—সুনীলকুমার ঘোষ।

ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত সরকার নবাবকে অনুরোধ করলেন — মানবতার মুখ চেয়ে ধর্ম নির্বিশেষে প্রজাপালন করুন।

অবিমৃষ্যকারী নবাব সেই অনুরোধকে দুর্বলের আবেদন বলে ভেবে নিলেন। দম্ভভরে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন — জুনাগড় মুসলমান রাজ্য, এখানে ইসলামী শাসন বলবৎ হবে।

এ ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করলেন না বল্লভভাই। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে জুনাগড় অধিকার করার নির্দেশ দিলেন।

বাদশাজাদার তন্দ্রা গেল ছুটে, খোয়াব গেল টুটে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুর্বার গতি বেগের পরিচয় পেয়ে তিনি পরিণাম বুঝতে পারলেন। দেওয়ান স্যার শাহ্ নওয়াজ ভুট্টোর হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলে দিয়ে অজস্র ধনরত্ন, চারজন বেগম ও প্রিয়তম কুকুরগুলো নিয়ে বিমান বন্দরে চলে গেলেন। বিমানে সব কুকুরগুলোর জায়গা হবে না শুনে নবাব খুবই দুঃখিত হলেন। এমন সময় একজন বেগম তাঁকে জানালেন — শাহানশাহ! আসার সময় তাড়াতাড়িতে আপনার শিশু-পুত্রকে প্রাসাদে ফেলে এসেছি।

নবাব খুবই বিরক্ত হলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বেগমকে গালাগালি করলেন। তারপরে কি যেন ভাবলেন একটুকাল। অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে বেগমকে বললেন — কি আর করব। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একটা গাড়ি নিয়ে চলে যাও প্রাসাদে, নিয়ে এসো ছেলেটাকে। তাড়াতাড়ি এসো, তোমরা ফিরে আসা মাত্র বিমান ছাড়ব।

খুশিতে ভেঙে পড়লেন বেগমসাহেবা। তিনি হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন 'টারমিনাল বিল্ডিংস' থেকে। নবাবজাদা তাকিয়ে থাকলেন তাঁর দিকে। বেগমসাহেবা গাড়িতে উঠলেন। গাড়িটা তীব্রবেগে বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে গেল।

নবাব ঘুরে দাঁড়ালেন। এগিয়ে এলেন পরিত্যক্ত কুকুরগুলোর কাছে। দুটি কুকুর দেখিয়ে জনৈক পরিচারককে বললেন — এই কুকুর দুটোকে বিমানে নিয়ে চল্। বেগমের সিটে বসিয়ে দে।

বিস্মিত পরিচারক সুলতানের আদেশ পালন করল। সুলতানও সেই সঙ্গে বিমানে উঠলেন। কুকুর দুটিকে একবার আদর করে পায়লটকে বিমান ছাড়ার আদেশ দিলেন। হয়তো বা মনে মনে তখন তিনি নিজের বুদ্ধির তারিফ করে থাকবেন—বেগম পাকিস্তানেও পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে শিশু-পুত্র। কিন্তু কুকুর? তোবা তোবা! এমন কুকুর তিনি কোথায় পাবেন?

পরিত্যক্তা বেগমসাহেবা কিছুক্ষণ বাদে তাঁর শিশু-পুত্রকে নিয়ে নিশ্চয় হাসিমুখেই ফিরে এসেছিলেন বিমানবন্দরে। কিন্তু তিনি নবাব-জাদার সারমেয় প্রীতির প্রকৃত পরিচয় পেয়ে কি করেছিলেন, তা জানা নেই আমার।

১৯৪৭ সালের ৯ই নভেম্বর ভারতীয় বাহিনী জুনাগড়ে পৌছল। স্যার ভুট্টো ভারতীয় সেনাপতির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। জুনা-গড় শহরের ঐতিহাসিক 'আপারকোটে' পাকিস্তানী পতাকার পরিবর্তে অশোকচক্র-মুদ্রিত ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা প্রোথিত হল। সাড়ে ন'শ' বছরের ধর্মান্ধতার অবসান হল। পুণ্যতীর্থ-প্রভাস ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের অঙ্গীভূত হল।

মাত্র পাঁচ দিন পরে জামসাহেব দিগ্বিজয় সিংজীকে সঙ্গে করে সর্দারজী প্রভাসে এলেন। প্রভাসের মানুষ আজও ১৯৪৭ সালের সেই ১৫ই নভেম্বরের কথা ভুলতে পারেন নি। কারণ এর আগে প্রভাস আর কোনদিন অমন প্রাণস্পর্শী উল্লাসে ফেটে পড়েনি।

সেদিন এই প্রান্তরে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত জনতার প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে সর্দারজী উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—

'The Government of India will rebuild the Temple of Somnath anew...'

তার তিন দিন আগে, দেওয়ালী উপলক্ষে আয়োজিত জুনাগড়ের এক জনসভায় তিনি একই কথা বলেছিলেন—'On this auspicious day of new year, we have decided that Somnath should be reconstructed. You, people of

Saurashtra, should do your best. This is a holy task in which all should participate.'

তাই প্রভাসের কৃতজ্ঞ অধিবাসীরা সর্দার প্যাটেল মেমোরিয়াল হল কমিটির সহায়তায় ১৯৭০ সালের ৪ঠা এপ্রিল এই প্রতিমূর্তি স্থাপন করেছেন।

সর্দারজীকে প্রণাম করে আমরা সোমনাথ মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলি। এই মন্দিরের সঙ্গে সর্দারজীর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে, চিরকাল থাকবে।

জামসাহেবকে সভাপতি করে সর্দারজী 'সোমনাথ ট্রাস্ট' গঠন করলেন। তাঁরা প্রথমে কুমারপালের বিধ্বস্ত মন্দিরটি ভেঙে ফেললেন। ১৯৫০ সালের ১৯শে এপ্রিল তৎকালীন সৌরাষ্ট্রের মুখ্য-মন্ত্রী শ্রী ইউ. সি. ধেবর খননকার্যের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সেই খননকার্য পরিচালনা করেন। তাঁরা প্রাচীন সোমনাথ মন্দিরের আদি-ব্রহ্মশীলা আবিষ্কার করতে সমর্থ হন। সেই ব্রহ্মশিলার ওপরেই বর্তমান জ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ঐ বছর (১৯৫০) ৮ই মে জামসাহেব মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরের বছর (১৯৫১) ১১ই মে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করলেন। ১৯৬৫ সালের মে মাসে জামসাহেব মন্দিরের কলস প্রতিষ্ঠা ও পতাকা উত্তোলন উৎসব সুসম্পন্ন করেন। বলাবাহুল্য সেই শুভদিনটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ সেদিন অসংখ্য শহীদের আত্মদান সার্থক হয়েছে, তাঁদের স্বর্গগত আত্মা তৃপ্তিলাভ করেছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য, সেদিন সর্দারজীও ছিলেন না এ-জগতে। কিন্তু সোমনাথের শহীদদের সঙ্গে সেদিন বল্লভভাইয়ের অমর আত্মাও শান্তিলাভ করেছেন।

প্রান্তর পেরিয়ে আমরা মন্দিরদ্বারে আসি। নাম — শ্রীদিগ্বিজয় দ্বার। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের গোপুরমকে স্মরণ করে নির্মিত হলেও

আধুনিক শৈলী এর সারা অঙ্গে। তিনটি চূড়াযুক্ত একটি ছোট দু-তলা বাড়ি। মূল্যবান পাথরে তৈরি। চূড়াগুলো চৌচালা, ওপরে শিখর-কলস। নিচের তলার ঠিক মাঝখানে দরজা। দু-পাশে কারুকার্যময় গোলাকার স্তম্ভ। কবাট জোড়া কাঠের। সুলতান মাহ্‌মুদ যে মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, তারও কবাট ছিল কাঠের তৈরি।

তোরণটি লম্বায় ৫৪ ফুট, চওড়ায় ৩১ ফুট এবং ৫১ ফুট উঁচু। নিচের তলায় দরজার দু-পাশে দুটি ব্যালকনীযুক্ত জানলা। দোতলায় এবং পাশেও এমনি জানলা রয়েছে। দরজার ঠিক ওপরেই হিন্দীতে লেখা — শ্রীদিগ্বিজয় দ্বার।

নতুন সোমনাথ মন্দির নির্মাণের জন্য সর্দারজীর পরেই যাঁর নাম নিতে হয়, তিনি জামনগরের মহারাজা জামসাহেব দিগ্বিজয়সিংজী। তিনিই নতুন সোমনাথ মন্দিরের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই মন্দিরদ্বার।

স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর পরে তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিনী মহারানী গুলাব-কুঁঅরবা সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই মন্দিরদ্বার তৈরি করে দিয়েছেন। ১৯৭০ সালের ১৭ই মে শ্রীসত্য সাই বাবা এই দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন।

দিগ্বিজয় দ্বারের শেষে ডানদিকে আরেকটি তোরণ। বোধকরি বিশিষ্ট অতিথিদের গাড়ি চড়ে মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করার জন্য। আমরা যেমন বিশিষ্ট নই, তেমনি আমাদের গাড়ি নেই। আমরা পায়ে হেঁটে দিগ্বিজয় দ্বার পেরিয়েই মন্দির চত্বরে আসি।

প্রশস্ত অঙ্গনের মাঝখানে মন্দির — সোমনাথের মন্দির। পোষাকী নাম — মহামেরু প্রাসাদ। প্রাসাদই বটে। যেমন গড়ন, তেমনি অবস্থান। সীমাহীন সাগরসৈকতে দাঁড়িয়ে সহাস্যে স্বাগত জানাচ্ছে আমাদের।

সারা মন্দির এলাকাটি দেওয়ালে ঘেরা। প্রচুর ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে ভেতরে। এমন ফাঁকা অবশ্য থাকবে না চিরকাল। এখানে তৈরি হবে নৃত্য-মণ্ডপ বা উপাসনা গৃহ। তৈরি হবে আরও

অনেক ছোট-বড় মন্দির। নৃত্য-মণ্ডপটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হবে ৭৫ ফুট আর উচ্চতা ৫৫ ফুট। শ্রীসোমনাথের কৃপায় সোমনাথ ট্রাস্টের পরিবর্ধন পরিকল্পনা অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই সার্থক হয়ে উঠবে। ভাবীকালের পুণ্যার্থীদের সেই বৃহত্তর মন্দির দর্শনের সৌভাগ্য হবে।

দিগ্বিজয় দ্বার পেরিয়েই প্রশস্ত অঙ্গন। তারই মাঝে, মন্দিরের সামনে, অর্ধচন্দ্রাকারে কয়েকখানি পাথরের বেঞ্চি—যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য। তারপর মন্দিরের সিঁড়ি।

সামনে তিনতলা নাট-মন্দির, পেছনে উচ্চতর গর্ভ-মন্দির। মন্দিরশীর্ষে শিখর কলস, ত্রিশূল ও পতাকা — জয় পতাকা। অধর্মের পরাজয় ও ধর্মের জয় ঘোষণা করছে।

কয়েক পা হেঁটে সিঁড়ির সামনে আসি। আমি এসেছি সেই পুণ্যভূমিতে, যেখানে পাঁচ হাজার বছর আগেও মানুষ মহাদেবের পূজা করেছে, যেখানে ব্রহ্মার নির্দেশে চন্দ্র ডিম্বাকৃতি স্বয়ম্ভু স্পর্শলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কথিত আছে ব্রহ্মা নিজেই নাকি ব্রহ্মশিলার ওপরে সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন। তার আগে এখানে ভৈরবনাথের লিঙ্গমূর্তি পুজো করা হত।

সেই ব্রহ্মশিলাকে কেন্দ্র করে খ্রীষ্ট জন্মের বহু আগে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম মন্দির। হাজার খানেক বছর ধরে সে মন্দিরে সোমনাথের পূজা হয়েছে। তারপরে তার ধ্বংসাবশেষের ওপরেই পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে দ্বিতীয় এবং লাল পাথরের তৃতীয় সোমনাথ মন্দির। ১০২৬ সালে সুলতান মাহ্‌মুদ সে মন্দির ধ্বংস করেন।

সিন্ধুর সংস্কৃতিবান পর্যটক ও ঐতিহাসিক আল বিরুণি সেবারে মাহ্‌মুদের সঙ্গে সোমনাথে এসেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে আমরা সেই ধ্বংসলীলার বর্ণনা পাই। বিরুণি লিখেছেন, 'মাহ্‌মুদ আদেশ দিলেন — লিঙ্গমূর্তির উপরাংশ ভেঙে ফেল। কাঁসার পাতে মোড়া মধ্যাংশের কাঁসা খুলে নিয়ে অশ্ববাহিনীর সামনে ফেলে দাও, যাতে কাফেরদের ঐ মূর্তি আমার ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়। আর

সোনার পাতে মোড়া মূর্তির শেষাংশ গজনীতে নিয়ে চল। সোনা খুলে নিয়ে আমি ঐ পাথরটাকে আমার মসজিদ দ্বারে রেখে দেব।'

আল বিরুণির বিবরণ থেকে আমরা সেকালের লিঙ্গমূর্তি ও তাঁর পূজার কথাও জানতে পারি। তিনি লিখে গিয়েছেন — 'সোমনাথ মন্দিরে মূর্তির স্নান ও পূজার জন্য প্রতিদিন গঙ্গা (অর্থাৎ প্রয়াগ) থেকে এক কলসী গঙ্গাজল এবং কাশ্মীর থেকে একঝুড়ি ফুল আসত।' সেই অশ্বযানের যুগে এর চেয়ে বড় বিস্ময় আর কি হতে পারে?

আল বিরুণি মাহ্মুদের সঙ্গে সোমনাথে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর লুণ্ঠনের সহযোগী ছিলেন না। তিনি এসেছিলেন হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে। তাই মাহ্মুদ যখন হিন্দু নিধন ও লুণ্ঠনে ব্যস্ত থাকতেন, তিনি তখন কোন হিন্দু পণ্ডিতের কাছে বসে সংস্কৃত-সাহিত্য, তর্কশাস্ত্র ও বেদান্ত প্রভৃতির পাঠ নিতেন। মাহ্মুদ কখনও তাঁর কথা শোনেন নি, তাঁর বই পড়েন নি। উপরন্তু এই মানবতাবোধের জন্য তাঁকে মাহ্মুদের অনেক নির্যাতন সইতে হয়েছে। তাহলেও এই সুপণ্ডিত এবং সত্যদ্রষ্টা পর্যটক লিখে গিয়েছেন, 'হিন্দুরা বিশ্বাস করে, সোমনাথের পূজা করলে সব কষ্ট দূর হয়ে যায়, সব আশা পূর্ণ হয়।'

এ-বিশ্বাস আজও আছে। আর তাই আমার অধিকাংশ সহযাত্রী আজ এসেছেন এখানে। কিন্তু আমি সোমনাথকে বিশ্বাস করলেও কোন প্রত্যাশা নিয়ে আসি নি। আমি এসেছি তাঁকে দর্শন করতে, আমার ভক্তি নিবেদন করতে।

সহযাত্রীরা সবাই তাই এগিয়ে গিয়েছেন সামনে, তাঁরা মন্দিরে প্রবেশ করেছেন। আর আমি মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মন্দিরের কথাই ভেবে চলেছি।

একাদশ শতাব্দীর শেষদিকে চালুক্য রাজারা সেই ধ্বংসস্তূপের ওপরে চতুর্থ মন্দির নির্মাণ করেন। মহারাজ কুমারপাল দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি এখানে সেই একই জায়গায় পঞ্চম মন্দির নির্মাণ করেন।

কুমারপালের মন্দিরই মেরু-প্রাসাদ নামে সুপরিচিত হয়। সেই মন্দিরের বর্ণনা প্রসঙ্গে জনৈক বিদেশী পর্যটক লিখেছেন — 'August like unto Mount Kailasa.' শিবালয় কৈলাস পর্বতের গড়নেই নাকি তৈরি করা হয়েছিল মন্দিরটি। চূড়াটি ছিল সোনার পাতে মোড়া। মন্দিরের সঙ্গে ছিল সুবিরাট নাট-মন্দির। সুন্দর ও মজবুত স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়েছিল মন্দিরটি। অশ্বখুরাকৃতি একটি বেদির ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল সোমনাথের লিঙ্গমূর্তি।

শুধু সোমনাথের মন্দির নয়, মহারাজা কুমারপাল সেই মন্দির এলাকার মধ্যেই নির্মাণ করেছিলেন গৌরী, ভীমেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর ও পাপমোচনের মন্দির। সেগুলির শিখরও সোনার পাতে মোড়া ছিল। পাপমোচনের মূর্তিটি ছিল তিন মানুষ উঁচু। কুমারপাল এখানে একটি মিঠে জলের সরোবর খনন করিয়েছিলেন।

পরধর্মদ্বেষী হানাদারের দল যুগে যুগে সে দেবালয়ের দ্বারে চড়াও হয়েছে। নানা ভাবে তারা সে মন্দিরকে আঘাত করেছে, বার বার ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছে! কিন্তু পারে নি।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সোমনাথ মন্দির লক্ষ লক্ষ হানাদারদের সকল আঘাত সয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যুগের পর যুগ ধরে সে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে — ভক্তি ভারতের আত্মা এবং আত্মা অবিনশ্বর।

সেই মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়েই সর্দারজী সেদিন নতুন মন্দির নির্মাণ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই ভগ্ন মেরু প্রাসাদকে ভেঙে ফেলেই তৈরি করা হয়েছে এই মন্দির — মহামেরু প্রাসাদ। এ যেন সেই রূপকথার পাখি 'ফীনিক্স' (Phoenix), যে নিজে-নিজে পুড়ে মরত। তারপরে নিজের ভস্ম থেকেই নবদেহ ধারণ করে আবার বেঁচে উঠত।

কিন্তু প্রাচীন মন্দিরের কথা আর নয়, এবারে নতুন মন্দির দর্শন করা যাক্। আমি এগিয়ে চলি। শুধু সুরম্য নয়, সুবিশালও বটে। পূর্বমুখী মন্দির। ১২৫ ফুট দীর্ঘ ও ১১৫ ফুট প্রশস্ত। শিখর সহ গর্ভ-মন্দিরের উচ্চতা ১৫৫ ফুট আর সভামণ্ডপটি ৭৫ফুট উঁচু। মন্দির

নির্মাণ করতে পঁচিশ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি সভামণ্ডপে। সাদা ও কালো মর্মর পাথরে বাঁধানো মসৃণ মেঝে। মাঝখানে শ্বেতপাথরের পূর্ণাবয়ব নন্দীমূর্তি।

"সেকি! ঘোষদা, আপনি এখনও এখানে! আমাদের তো দর্শন হয়ে গেল! আমরা ওপরে যাচ্ছি।"

সাহাবাবুর ডাকে ফিরে তাকাই। বলি, "ওপরে যাচ্ছেন কেন? সেখানে কি আছে?"

'History of Somnath through the ages in Pictures.' অমিয়বাবু মাঝখান থেকে উত্তর দেন।

বলি, "বেশ তো যান।"

"আপনি যাবেন না মামু?" বিউটি জিজ্ঞেস করে আমাকে।

উত্তর দিই, "হ্যাঁ যাবো, একটু বাদে। আগে সোমনাথজীকে দর্শন করে নিই।"

ওরা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়, আমি এসে দাঁড়াই গর্ভ-মন্দিরের দ্বারে। সামনে কারুকার্যময় শ্বেতপাথরের রেলিং, তারপরে দরজা — রুপোর পাতে মোড়া।

দরজার সোজাসুজি মন্দিরের মাঝখানে গোলাকার সুদৃশ বেদির ওপরে সোমনাথ — দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রথম মূর্তি। সুবিশাল ও সুন্দর শিবলিঙ্গ। এতবড় শিবলিঙ্গ এর আগে আমি কোথা দেখি নি। ভারতের আর কোথাও আছে বলেও শুনি নি। জানি না এটি বিশ্বের বৃহত্তম লিঙ্গমূর্তি কিনা?

সোমনাথের মাথার ওপরে রুপোর ছত্র এবং জলপাত্র। ফোটা ফোটা জল পড়ছে শিবের মাথায়। একটি রুপোর সাপ চারবার পাক খেয়ে সোমনাথকে বেষ্টন করে পেছন থেকে তাঁর মাথার ওপরে ফণা তুলে আছে।

লিঙ্গমূর্তির গায়ে 'ওঁ' লেখা। বেদির ওপরে ফুল-বেলপাতার সমারোহ। প্রতি মুহূর্তে দলে দলে নতুন ভক্ত আসছেন। তাঁরা তাঁদের অন্তরের নৈবদ্যের সঙ্গে ফুল-বেলপাতার ডালি নিয়ে আসছেন।

নিয়ে আসছেন দুধ এবং গঙ্গাজল। তাঁরা সোমনাথকে স্নান করাচ্ছেন, সোমনাথের পুজো করছেন। শিবের মতো এমন উদার দেবতা যে আর নেই ত্রিভুবনে। যে কেউ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে, যেভাবে ইচ্ছে তাঁর পুজো করা যায়। তাঁর কাছে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল কোন পার্থক্য নেই। ভক্তি ভরে একবার ডাকলেই তিনি তাঁকে কৃপা করেন।

সোমনাথের ঠিক পেছনে দেওয়ালের ধারে গেরুয়া রঙের কাপড় পরা শ্বেতপাথরের অনিন্দ্যসুন্দর বিষ্ণুমূর্তি। তাঁর দু'পাশে দু'খানি কাঠের চৌকির ওপরে শিবের দু'টি আবক্ষমূর্তি। পেছনের দেওয়ালে ব্রহ্মা ও পার্বতী প্রভৃতির কয়েকখানি ছবি টাঙানো রয়েছে।

মানুষের ভগবান বলেই বোধহয় ভক্তদের জন্য এ মন্দিরের দ্বার সারাদিনই উন্মুক্ত। সকাল ছ'টা থেকে দুপুর দু'টো, বিকেল তিনটে থেকে রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত, যে-কোন সময় দর্শন করা যায় সোমনাথকে। প্রতিদিন সকাল সাতটা ও দুপুর বারোটায় সোমনাথের আরতি হয়।

দর্শন প্রণাম ও প্রদক্ষিণের পরে আমি বেরিয়ে আসি সোমনাথ মন্দির থেকে। সহযাত্রীরা এখনও ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ইতিহাসের সোমনাথকে দেখছেন। আমারও সেখানে যাবার কথা। কিন্তু আমি হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরের পেছনে সাগরতীরে এসে দাঁড়াই। তাকিয়ে থাকি বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের দিকে। অনন্তকালের সাগরতীরে দাঁড়িয়ে আমি ইতিহাসের সোমনাথকে স্মরণ করি।

মহাসাগর মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষী। এই তরঙ্গসঙ্কুল সাগর বিগত আড়াই হাজার বছর ধরে প্রতিদিন সোমনাথকে দেখেছে। মহাপণ্ডিত চাণক্য থেকে মহানায়ক বল্লভভাই পর্যন্ত সবাই তার সুপরিচিত। সোমনাথের সমস্ত ভাঙা-গড়ার কাহিনীকে বুকে নিয়ে সে নির্বিকার রয়েছে। একই ভাবে বয়ে চলেছে। সে চির-প্রবহমান। একটি দিনের তরেও তার চলা বন্ধ হয় নি। দুঃখে সে যেমন ভেঙে পড়ে নি, তেমনি সুখের দিনেও কর্তব্য বিস্মৃত হয় নি।

সর্বদা তার তরঙ্গবাহু দিয়ে সোমনাথের পা ধুয়ে দিচ্ছে।

সাগর নির্বিকার। কারণ সে জানে সোমনাথ সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে। তিনি চিরবিরাজমান এই পুণ্যতীর্থে। এই মন্দির বা লিঙ্গমূর্তি উপলক্ষ মাত্র। দেবালয় বা বিগ্রহ চূর্ণ করলেই দেবভূমি কলুষিত হয় না।

সাগর জানত শত মাহ্‌মুদের সাধ্য ছিল না সোমনাথকে ধ্বংস করে, সহস্র আওরঙ্গজেবের শক্তি ছিল না সোমনাথকে মুছে ফেলে। সে জানত সোমনাথ ঠাঁই নিয়েছেন কোটি কোটি মানুষের মনে। তাঁর ক্ষয় নেই, বৃদ্ধি নেই। তাঁর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। তাঁর আদি মধ্য ও অন্ত নেই। তাঁর ইহকাল ও পরকাল নেই। তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, তিনি থাকবেন।

তাই তো আড়াই হাজার বছর পরে পূর্ব-সমুদ্রের তীরভূমি থেকে আমি ছুটে এসেছি এই পশ্চিম সমুদ্র-সৈকতে।

এসেছি চিরকালের সোমনাথকে দর্শন করতে। এসেছি ভক্তের ভগবানকে প্রণাম জানাতে। এসেছি শাশ্বত ভারতের আত্মাকে আমার প্রাণের নৈবেদ্য নিবেদন করতে।

।। নয় ।।

সাগরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পার্বতীর মন্দিরে আসি। সাহা-বাবুদের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। তাঁরাও পার্বতী মন্দির দর্শন করতে এসেছেন।

ছোট হলেও সুপ্রাচীন মন্দির। পাণ্ডাজী বললেন, "দ্বাদশ শতাব্দীতে মহারাজা কুমারপাল সোমনাথ মন্দিরের সঙ্গে এ মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। এটি আজ সেকালের স্মৃতি-মন্দির।"

ছোট বলেই হয়তো পরধর্মবিদ্বেষীদের তেমন নজর পড়ে নি এই মন্দিরের দিকে। শাশ্বত ভারতের প্রতিনিধিরূপে আজও সে রয়েছে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সোমনাথ ট্রাস্ট কেন এ মান্দরটির সংস্কার সাধন করছেন না, বুঝতে পারছি না।

হনুমানজী, মহাকালী ও বিনায়ক মন্দির দর্শন করে সহযাত্রীদের সঙ্গে বীর হমীরজীর স্মৃতি-মন্দিরে আসি। স্থানীয় নাম 'হমীরজী লাঠিয়ার দেরী'। লাঠি গ্রামের মানুষ বলে তাঁকে লাঠিয়া বলা হয়েছে। তিনি ছিলেন একজন গোহিল বংশীয় রাজপুত। গুজরাতী 'দেরী' শব্দের অর্থ স্মৃতি-মন্দির। কৃতজ্ঞ প্রভাসবাসীরা প্রায় পাঁচশ' বছর ধরে সেই অমর শহীদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসছেন। সোমনাথ মন্দিরের আঙিনায় হনুমান মন্দিরের পাশে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর স্মৃতি-মন্দির। আমার মতো শত শত দর্শনার্থী প্রতিদিন এখানে দাঁড়িয়ে হমীরজীর প্রতি তাদের অন্তরের নৈবেদ্য নিবেদন করে যায়।

সোমনাথের সেই সুমহান ভক্ত ও দেশপ্রেমিকের কথা মনে পড়ছে আমার। সশ্রদ্ধচিত্তে আমি সেই আত্মত্যাগের কাহিনী ভেবে চলি —

সৌরাষ্ট্রে খবর এসে পৌঁছল নিষ্ঠুর ও পরধর্মদ্বেষী মহম্মদ বেগড়া সোমনাথ লুঠ করতে আসছেন। বেগড়া ও বেগড়ো মানে যাযাবর। মহম্মদ আমেদাবাদের সুলতান হলেও ছিলেন একজন যাযাবর দস্যু।

লাঠি গ্রামের ভীমজী গোহিলের ছোট ছেলে হমীরজী তখন বাড়িতেই ছিলেন। কথাটা কানে এলো তাঁর। তিনি বিচলিত হলেন। কিন্তু ভাবলেন দুর্দান্ত দস্যু মহম্মদের বিরুদ্ধে তিনি কীই-বা করতে পারেন?

রাতে খেতে বসে তিনি বৌদিকে বললেন কথাটা। বৌদি চমকে উঠলেন। বললেন — যবনরা আবার সোমনাথকে কলুষিত করতে আসছে শুনেও তুমি চুপ-চাপ বসে রয়েছো! তুমি না রাজপুত, তুমি না ক্ষত্রিয়!

হমীরের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তিনি নতমস্তকে বসে রইলেন। তারপরে বৌদির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন — দুর্ধর্ষ মহম্মদের বিরুদ্ধে আমি কি করতে পারি, বলো?

সঙ্গে সঙ্গে সেই রাজপুত রমণী গর্জে উঠলেন — তুমি নিজের প্রাণের বিনিময়ে সেই যবনটাকে বধ করে ভুভার লাঘব করতে পারো।

—কিন্তু আমি যে দুর্বল ?

—বাহুবল তুচ্ছ, মনোবলই মানুষের মূল শক্তি। তুমি যাচ্ছ শহীদ হতে আর সে আসছে লুঠ করতে। ওরা তোমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন ?

উত্তেজিত হমীর খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়াতে গেলেন। বৌদি তাঁর হাত ধরে আবার বসিয়ে দিলেন। সস্নেহে বললেন—এখুনি যাচ্ছ কোথায় ? রওনা তো হবে কাল সকালে। আমি তোমার দাদাকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তোমার সঙ্গী ও পথের খাবার যোগাড় করে আনছি। কাল সকালে স্নান ও পুজো করে প্রসাদ নিয়ে রওনা হবে প্রভাসের পথে। সারাদিন হাঁটতে হবে। এখন খেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়।

তাই করলেন হমীর। পরদিন সকালে তাঁর গ্রাম ও গ্রামের মানুষ, তাঁর দাদা ও বৌদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি রওনা হলেন প্রভাসের পথে। না, একা নয়, লাঠি গ্রামের আরও দু-শ' জন যুবক তাঁর সঙ্গী হলেন। হমীরের বৌদির মতো, তাঁদের মা-বোন-স্ত্রী ও কন্যারাও হাসি মুখে বিদায় দিলেন সে বীর রাজপুতদের। চোখের জল ফেলে কেউ তাঁদের মুক্তিপথকে পিচ্ছিল করে তুললেন না।

সারাদিন হেঁটে সেদিন সন্ধ্যায় তাঁরা সরোড পাহাড়ের পাদদেশে শিহোর গ্রামে পৌঁছলেন। যাযাবর গ্রামবাসীদের সর্দার বেগড়া ভীল তাঁদের আতিথ্য দান করলেন। রাতে খেতে বসে কথায় কথায় ভীল হমীরকে জিজ্ঞেস করলেন—তা তোমরা এমন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সোমনাথ চলেছো কেন ?

হমীর তাঁর প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারলেন, তিনি মহম্মদ বেগড়ার সোমনাথ আক্রমণের খবর পান নি। তিনি তাঁকে সবকথা খুলে বললেন।

দিলখোলা ও হাসিখুশি মানুষটি সহসা গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটুকাল চুপ করে থেকে বলে উঠলেন—সেই শয়তানটা বুঝি সোমনাথেও আসছে। ভালই হল, সেও বেগড়া আমিও বেগড়া।

দুই যাযাবর একবার মুখোমুখি হওয়া যাক্।

— আপনি যাবেন ? আনন্দে প্রায় চিৎকার করে ওঠেন হমীর। পরিবেশনরতা ভীলের কিশোরী কন্যার হাত থেকে হাতাখানি মাটিতে খসে পড়ে। উচ্ছ্বাসের আতিশয্যের জন্য লজ্জা পেলেন হমীর।

শান্তকণ্ঠে সর্দার বললেন — হ্যাঁ, আমিও যেতে চাই তোমার সঙ্গে। শুধু যাওয়া নয়, প্রাণপণ করে সেই পাষণ্ডটার সঙ্গে লড়াই করতে চাই। কিন্তু আমার যে হাত-পা বাঁধা।

— কেন ? প্রশ্ন করলেন হমীর।

মেয়েকে দেখিয়ে সর্দার উত্তর দিলেন — আমি যে ওর মায়ের মৃত্যুশয্যায় তাকে কথা দিয়েছি, ওর বিয়ে না দিয়ে আমি আর কখনও যুদ্ধে যাবো না।

বাবার পাশে দাঁড়িয়ে মেয়ে এতক্ষণ নিঃশব্দে তাদের কথাবার্তা শুনছিল। এবারে সেই কিশোরী রাজপুতানী কথা বলে। হমীরকে লক্ষ্য করে সে তার বাবাকে বলে — ওনাকে জিজ্ঞেস করো না, উনি আমাকে পায়ে ঠাঁই দেবেন কিনা ?

সর্দার চমকে ওঠেন। বিস্মিত হমীর কিশোরীর দিকে তাকান। দুজনের চোখে দুজনের চোখ পড়ে।

হমীর চোখ নামিয়ে নেয়। কিন্তু কিশোরী এগিয়ে আসে তাঁর কাছে। করুণ কণ্ঠে বলে — বাবার হয়ে আমিই জিজ্ঞেস করছি আপনাকে, আপনি কি আমাকে পায়ে ঠাঁই দেবেন না ?

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নেয় হমীর। বলে — পায়ে নয়, তোমার স্থান আমার মনে। কিন্তু আমি যে যুদ্ধে যাচ্ছি। হয়তো আর ফিরে আসব না সোমনাথ থেকে।

— কেন আসবে ? তুমি যে সোমনাথেই থাকবে — যুগ থেকে যুগান্তরে। তাই তো আমি তোমার গলায় মালা দিতে চাইছি। তোমার পুণ্যে আমিও অমর হব।

সেদিন রাতেই বিয়ে হল তাদের। সামাজিক অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে সূর্যোদয়ের সামান্যই দেরি ছিল। সেই সময়টুকু কিশোরী

তার স্বামীর বুকে মাথা রেখে বাসর জাগল।

ভোরের পাখি ডেকে উঠতেই কিশোরী উঠে বসল। স্বামীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণাম করল।

না, সে কাঁদল না। উদীয়মান সূর্যের কাছে করজোড়ে কামনা করল — তোমার কিরণরশ্মির মতো আমার স্বামীর বীরগাঁথায় বসুন্ধরা উদ্ভাসিত হোক্।

তারপরে সে নিজের হাতে স্বামীকে বীরের পোষাক পরালো। হাসিমুখে পিতা ও পতিকে প্রভাসের পথে বিদায় দিল — শেষ বিদায়।

হমীর ও ভীল তাঁদের সঙ্গীদের নিয়ে সন্ধ্যার সময় প্রভাস দুর্গের দ্বারে উপস্থিত হলেন। দুর্গের প্রহরীরা পরম সমাদরে তাঁদের বরণ করলেন। হমীর তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে দুর্গে প্রবেশ করলেন। কিন্তু ভীল বললেন — আমি বেগড়া, আমি যাযাবর। তোমাদের পাথুরে ঘরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি দুর্গের বাইরেই থাকব।

— কিন্তু আমরা খবর পেয়েছি, মহম্মদ এসে গিয়েছে। আজ রাতেই সে আমাদের আক্রমণ করবে!

হাসতে হাসতে ভীল বললেন — তাই তো আমি বাইরে থাকতে চাই। তোমাদের আগেই আমি তার সঙ্গে মোলাকাত করব। সেও বেগড়া, আমিও বেগড়া। আগে দুই বেগড়ায় বোঝাপড়াটা হয়ে যাক্।

প্রহরীদের অনুমান সত্য হল। শেষ রাতেই মহম্মদের সৈন্যরা প্রভাস দুর্গ আক্রমণ করল। ভীল ও হমীর তাঁদের সঙ্গীদের সঙ্গে বীরের মৃত্যু বরণ করলেন।

তাঁরা সোমনাথকে রক্ষা করতে পারলেন না। কিন্তু কিশোরীর কামনা পূর্ণ হল। আজও লোক-গায়করা গুজরাতের পথে পথে হমীরজীর বীরগাঁথা গেয়ে চলেছেন। প্রভাত-সূর্যের কিরণরশ্মির মতোই হমীরজী গোহিলের বীরগাঁথায় বসুন্ধরা উদ্ভাসিত হয়ে আছে। বীর হমীরের সঙ্গে তাঁর কিশোরী কুলবধূও অমর হয়ে রয়েছে গুজরাতের ইতিহাসে।

হমীরজীর স্মৃতিমন্দিরে প্রণাম রেখে আমরা হাঁটতে থাকি দিগ্বিজয় দ্বারের দিকে। চলতে চলতে বিউটি জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা মামু, বেগড়া ভীলের কোন শহীদস্তম্ভ নেই এখানে ?"

আমি কিছু বলতে পারার আগেই পাণ্ডাজী উত্তর দেন, "আছে। একটু দূরে, ঐ ভাটিয়া ধর্মশালার কাছে।"

"আরেকটা কথা..." বিউটি আমার দিকে তাকায়।

"বল।"

"হমীরজীর সেই কিশোরী বধূর কি হল ?"

বিউটি কলেজে পড়া আধুনিকা তরুণী। স্বাভাবিক ভাবেই সেই কিশোরীর জন্য তার মন উতলা হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার সম্পর্কে লোক-গায়করা যে একেবারেই নীরব। আমার যে কিছুই জানা নেই তার কথা। আমি চুপ করে থাকি।

বিউটি বোধহয় বুঝতে পারে আমার অসহায় অবস্থা। সে নিজেই বলে, "হমীরজীর বীরত্ব নিয়ে রচিত হয়েছে লোকগীতি। তাঁর বাবার আত্মোৎসর্গের কথাও ঠাঁই পেয়েছে সেই গানে। মাতৃহীনা সেই কিশোরীর আত্মত্যাগও কিছু কম নয়। বরং বেশিই বলা চলে। জীবনে সে মাত্র কয়েকঘণ্টা স্বামীসঙ্গ লাভ করেছে। পিতা ও পতিকে সে অঞ্জলি দিয়েছে সোমনাথের পায়ে। তারপরে সেই শোকস্মৃতি বুকে নিয়ে সারাজীবন চোখের জল ফেলেছে। অথচ গীতিকাররা তার সম্পর্কে বোধহয় অখণ্ড নীরবতা পালন করে গিয়েছেন। কেবল কাব্যে উপেক্ষিতাদের দলে কিশোরীর নাম যুক্ত হয়েছে।" শেষ করে বিউটি। তার বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

আমি চুপ করে থাকি। শুধু আমি নই, আমার সহযাত্রীরা সবাই নীরবে পথ চলছেন। বিউটির অভিযোগ খণ্ডন করার মতো কোন যুক্তি জানা নেই তাঁদের।

একটু বাদে বোধহয় অস্বস্তিকর নীরবতার অবসান করবার জন্যই ম্যানেজার কথা বলে, "সোমনাথে প্রতিদিনই শত শত যাত্রী আসেন।

তবে এখানে সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় কার্তিকী পূর্ণিমাতে। সেদিন মেলা বসে এই মন্দির চত্বরে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার যাত্রী আসেন এই পুণ্যতীর্থে।"

মন্দির এলাকার বাইরে বেরিয়ে আসি। ইচ্ছে ছিল একবার সোমনাথ ট্রাস্টের অফিসে যাবো। দেখা করব এ.স্টট ম্যানেজারের সঙ্গে। কিন্তু আমাদের ম্যানেজার জানালো, "এখন অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া সেখানে আবার আপনার কি দরকার?"

হেসে বলি, "ভাবছিলাম একবার এস্টেট ম্যানেজারকে বলব, আপনারা আগ্রাদুর্গ থেকে প্রাচীন সোমনাথ মন্দিরের দরজাজোড়া নিয়ে আসুন। সেই অমূল্য ঐতিহাসিক নিদর্শনকে এখানেই সংরক্ষণ করুন, তাতে এই মন্দিরের মূল্য যাবে বেড়ে।"

"সাধু প্রস্তাব।" ম্যানেজার মন্তব্য করে। "তবে এ-সব কথা এস্টেট ম্যানেজারকে বলে তেমন লাভ হতো না। তার চেয়ে কলকাতায় ফিরে গিয়ে জামনগরে ট্রাস্টের হেড-অফিসে চিঠি লিখবেন।"

"আজকাল সোমনাথ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান কে?"

"শ্রীমোরারজীভাই দেশাই।"

সহসা সাইনবোর্ডটার দিকে নজর পড়ে আমার। স্থানীয় যাদুঘর দেখতে যাবার নিমন্ত্রণ রয়েছে তাতে। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করি, "আর কতক্ষণ আমরা আছি এখানে?"

"কেন মিউজিয়ামে যাবেন?"

"একবারটি দেখে এলে হতো।"

"বেশ তো চট করে ঘুরে আসুন। দেখবেন, বেশি দেরি করবেন না যেন।" সে ইসারা করে পথটি দেখিয়ে আবার বলে, "কয়েকপা হেঁটেই একটা বাজার। বাজার ছাড়িয়েই মিউজিয়াম। মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ। আধঘণ্টার মধ্যে ঘুরে আসবেন কিন্তু। সন্ধের আগেই ভালকাতীর্থে পৌছতে হবে।"

'কণ্ডাক্টেড ট্যুর'। সুতরাং নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াবার

অধিকার যেমন নেই, তেমনি ক্ষমতা নেই ম্যানেজারের নির্দেশ অমান্য করবার। অতএব মাথা নেড়ে জোর কদমে এগিয়ে চলি।

দোকান-পাট ও বাড়ি-ঘরের গা ছুঁয়ে পথ। দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি।

থামতে হয়। পথের ডানদিকে বাড়ি-ঘরের পেছনে ঝকঝকে একটি উঁচু মন্দির। জৈন শিল্পরীতিতে তৈরি। কার মন্দির? একবার দেখে গেলে হতো। আমি ঘড়ির দিকে তাকাই।

পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জনৈক প্রৌঢ় এগিয়ে আসেন আমার কাছে। হিন্দীতে জিজ্ঞেস করেন, "যাবেন নাকি দর্শন করতে?"

আমি আবার ঘড়ির দিকে তাকাই।

ভদ্রলোক বলেন, "বেশি সময় লাগবে না। চলুন, চট করে দেখিয়ে দিচ্ছি। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমাকে একটা টাকা দেবেন।"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। সময় কম, অথচ দর্শন করতেও ইচ্ছে করছে। একে সঙ্গে নিলে সুবিধাই হবে। বলি, "চলুন, চট করে দেখিয়ে দেবেন।"

"তাই দেবো, আসুন।"

আমি পথপ্রদর্শককে অনুসরণ করি।

ভদ্রলোক চলতে চলতে বলতে থাকেন, "এই মন্দিরের নাম— গজেন্দ্রপূর্ণ প্রাসাদ। ১৯৫২ সালে নির্মিত। এটি প্রভাসের বৃহত্তম জৈন মন্দির। চন্দ্রপ্রভ প্রভুর স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত।

"প্রভাস হিন্দুদের মতো জৈনদের কাছেও পুণ্যতীর্থ। জৈন ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণে বহুবার প্রভাসের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে —প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথজীর পুত্র ভরতরাজ প্রভাস দর্শনে এসেছিলেন। কারণ তিনি জানতে পেরেছিলেন যে অষ্টম জৈন তীর্থঙ্কর শ্রীচন্দ্রপ্রভ প্রভু এখানেই জন্মগ্রহণ করবেন। তাই ভরতরাজ এখানে এসে জনপদের পত্তন করে একটি মন্দির নির্মাণ করেন।

"দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর অজিতনাথ প্রভুর নির্দেশে সম্রাট সগরও এখানে এসেছিলেন। যথাসময়ে এক পৌষ ত্রয়োদশী তিথিতে ইক্ষ্বাকু বংশীয়

রাজা মহাসেনের ঔরসে রানী লক্ষ্মণার গর্ভে প্রভাসের চন্দ্রপুরী নগরীতে চন্দ্রপ্রভ প্রভুর জন্ম হয়। চব্বিশ বছর বয়সে তিনি তৎকালীন প্রভাসের রাজা চন্দ্রয়শাকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন।

"মহারাজা চন্দ্রয়শা চন্দ্রপ্রভ প্রভুকে খুবই ভক্তি করতেন। তাই দীক্ষা নেবার আগেই তিনি তাঁর প্রাসাদে চন্দ্রকান্তমণি দিয়ে চন্দ্রপ্রভ প্রভুর একটি মণিময় মূর্তি নির্মাণ করিয়েছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে রাজর্ষি চন্দ্রশঙ্কর রাজা চন্দ্রয়শাকে বলেছিলেন—যেহেতু ভগবান চন্দ্রপ্রভা এখানে বিরাজ করছেন, সেইহেতু এই পুণ্যতীর্থ জগতে চন্দ্রপ্রভাস নামে বিখ্যাত হবে।

"আর সেই দীক্ষান্ত ভাষণে চন্দ্রপ্রভ প্রভু ঘোষণা করেছিলেন—সকল তীর্থের সেরা এই তীর্থ।

"ষোড়শ তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ প্রভুও প্রভাসকে পুণ্যতীর্থ বলে উল্লেখ করেছিলেন। তাই প্রত্যেক যুগে বিশিষ্ট জৈনভক্তরা প্রভাস দর্শনে এসেছেন। এবং সে আসা-যাওয়া আজও চলেছে, চিরকাল চলবে।"

আমরা মন্দির তোরণে আসি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে অঙ্গন পেরিয়ে উঠে আসি মন্দিরে। তিনটি অংশে বিভক্ত, তিনতলা মন্দির। পথপ্রদর্শক দাবী করেন, "ভরতরাজ এখানেই প্রথম মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। একই জায়গায় ১৯৫২ সালে এই নতুন মন্দির তৈরি করা হয়েছে। তিনিটি শিখরযুক্ত এই মন্দিরটি লম্বা ও চওড়ায় ১০০ ফুট এবং ৮৫ ফুট উঁচু।"

পথপ্রদর্শকের সঙ্গে মূল-মন্দিরে আসি। মধ্যস্থলে চন্দ্রপ্রভ প্রভুর অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি। আমার প্রশ্নের উত্তরে পথপ্রদর্শক বলেন, "মূর্তিটির উচ্চতা পৌনে চার ফুট।"

মূল-নায়কের ডানদিকে শ্রীশীতলনাথজী, শ্রীসুবিধিনাথজী, শ্রীসম্ভবনাথজী ও শ্রীচিন্তামণি পার্শ্বনাথজীর মূর্তি। আর তাঁর বাঁয়ে রয়েছেন শ্রীমল্লনাথজী, শ্রীচন্দ্রপ্রভজী এবং শ্রীপার্শ্বনাথজীর প্রতিমূর্তি। আমি দর্শন করি।

নিজের সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না, এই মন্দিরটি

দর্শন না করলে যে পুণ্যতীর্থ-প্রভাসের অনেকখানিই অদেখা রয়ে যেত। ভাগ্যিস ভদ্রলোক পেটের দায়ে পথে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

গজেন্দ্রপূর্ণ প্রাসাদ তথা চন্দ্রপ্রভ মন্দির থেকে নেমে আসি নিচে। পথপ্রদর্শকের সঙ্গে দর্শন করি মল্লীনাথজী, মহাবীরজী, অজিতনাথজী ও ঋষভদেবের মন্দির।

পথপ্রদর্শক বলেন, "আপনার সময় নেই, নইলে আপনাকে নিয়ে যেতাম মেরীয়াকাকায়।"

"সে আবার কোথায়!" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

"হিরণ্য নদীর তীরে একটি রমণীয় স্থান মেরীয়াকাকা — জৈনদের এক পরম-পবিত্র ক্ষেত্র।"

কথা বলতে বলতে আমরা ফিরে আসি পথে। এবারে পথ-প্রদর্শকের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। তাঁকে দিতে হবে দর্শনী।

পাঞ্জাবির পকেট থেকে একখানি দু'টাকার নোট বের করে তাঁর হাতে দিই। একটুকাল চুপ করে থেকে তিনি নোটখানি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরেন।

বিরক্ত হই। এক টাকার জায়গায় দু'টাকা দিলাম, তাও নিতে চাইছে না। লোকটা তো ভারী মতলববাজ। কর্কশ স্বরে বলি, "টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছেন কেন?"

ক্ষীণস্বরে উত্তর দেন ভদ্রলোক, "আমার কাছে যে এক টাকা নেই।"

নিজের মানসিকতার জন্য মনে মনে লজ্জা পাই। ছি ছি! এই সরল ও সৎ মানুষটিকে আমি মতলববাজ বলে ভেবে নিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি তার হাতখানি ধরে বলি, "আপনাকে একটাকা আর ফেরৎ দিতে হবে না। আপনি এই দু'টাকাই নিন।"

"কিন্তু......"

"কোন কিন্তু নয়। আমি খুশি হয়েই আপনাকে এক টাকা বেশি দিলাম।"

প্রৌঢ়ের চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। তবু তিনি হাতখানি

কপালে ঠেকিয়ে অব্যক্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, "সুখী হও বাবা। প্রভু তোমার মঙ্গল করুন।"

আমারও চোখদুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। প্রৌঢ়ের সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকা উচিত হবে না। তাড়াতাড়ি তাকে নমস্কার করে আমি এগিয়ে চলি আপন পথে। আমি যে পথিক। পথের মানুষের ব্যথায় ব্যথিত হবার অবসর নেই আমার। আমাকে অবিচলিত মনে ও ক্লান্তিহীন চরণে পথ চলতে হবে।

জৈন-মন্দির ছাড়িয়ে কয়েকপা এগিয়েই পথের বাঁদিকে প্রভাসের যাদুঘর — 'Prabhaspatan Museum, Dept. of Museum, Gujrat State'.

ভেতরে ঢুকে চারিদিকে দেওয়াল ঘেরা একফালি ফাঁকা জায়গা, তারই একাংশে টালির ছাউনির নিচে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পড়ে আছে। ছাউনির মেঝে এবং দেওয়াল নেই।

মনটা খারাপ হয়ে যায়। এই দেখবার জন্য এমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছি! নিদর্শনগুলিতে কিছু লেখা পর্যন্ত নেই। সুতরাং সময় নষ্ট না করে ফিরে যাওয়াই ভাল।

কিন্তু ফিরতে পারি না। কয়েকজন যুবক এক জায়গায় জড়ো হয়ে কি যেন করছিল, তাদেরই একজন এগিয়ে আসে আমার কাছে। ইংরেজীতে বলে, "মিউজিয়াম দেখতে চান?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ তো, যান না। সামনের ঐ বাড়িটা হল মিউজিয়াম।"

"এগুলো কি তাহলে?" আমি চারিপার্শ্বের নিদর্শনগুলো দেখাই।

"এগুলোর এখনও কালনির্ণয় কিংবা শ্রেণীবিভাগ শেষ হয় নি।"

ছেলেটিকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি মিউজিয়ামের দিকে চলা শুরু করি।

"কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব।"

ছেলেটির কথায় আবার থামতে হয় আমাকে। আমি তার দিকে

ফিরে দাঁড়াই। সে বলে, "আপানি কি কলকাতা থেকে এসেছেন, আপনি কি বাঙালী?"

হেসে বলি, "হ্যাঁ। কিন্তু বুঝলেন কেমন করে?"

"আপনার পোষাক ও চেহারা দেখে।" একবার একটু থামে সে। তারপরে আবার বলে, "জানেন কলকাতা আমার জন্মভূমি।"

আমি সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাই। সে আবার বলে, "সত্যি বলছি, মহাত্মা গান্ধীর, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমি কলকাতায় আমার জন্ম হয়েছে। এবং এটা আমার একটা মস্ত গৌরব।"

"আপনার বাবা-মা বুঝি কলকাতায় থাকতেন?"

"হ্যাঁ। বাবা তখন কলকাতায় 'পোস্টেড্'। তারপরেও তিনি দশ বছর ওখানে ছিলেন। আমি ক্লাস সিক্স পর্যন্ত কলকাতায় পড়াশুনা করেছি। তখন বেশ ভাল বাংলা বলতে পারতাম। এখন আর পারি না ঠিকমত, তবে বুঝতে পারি মোটামুটি। কিন্তু হিন্দী স্কুলে পড়তাম বলে আমার আর বাংলা লেখা ও পড়া শেখা হয়ে ওঠে নি। বড্ড আপশোষ হয় এখন। জানেন, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র আমার সবচেয়ে প্রিয় লেখক। অথচ দুর্ভাগ্য, আমি বাংলা পড়তে পারি না।" হঠাৎ থেমে যায় ছেলেটি। বলে, "আপনার বোধহয় দেরি করিয়ে দিলাম!"

"না, না। ঠিক আছে।" ভদ্রতার খাতিরে বলতে হয় আমাকে।

সে বলে, "চলুন, আপনাকে মিউজিয়াম দেখিয়ে দিই।"

"না, না, তার কোন দরকার নেই। আমি নিজেই দেখে নিতে পারব।" প্রতিবাদ করি।

"তা পারবেন। কিন্তু আমি সঙ্গে থাকলে আপনার সুবিধা হবে।"

আর আপত্তি করি না, কারণ তাতে কোন লাভ হবে না। এরা কথা বেচে খায়। কি আর করা যাবে? অদৃষ্টে দণ্ড ছিল, আবার গোটা পাঁচেক টাকা খসল আর কি? মিউজিয়ামে সাধারণতঃ গাইডদের ফি একটু বেশি হয়।

এবারে আর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নয়। সে চলতে চলতে গাইডের

নিয়ম-মাফিক বক্তৃতা শুরু করে দেয়, "এই যাদুঘরটি ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা ও স্থাপত্য-শিল্পের কিছু দুর্লভ নিদর্শন দেখতে পাবেন। এখানকার সমস্ত মূর্তি মন্দিরগাত্রের অংশ এবং শিলালিপি সোমনাথের প্রাচীন মন্দির ও প্রভাসের অন্যান্য ভগ্ন মন্দির থেকে সংগৃহীত। অবশ্য প্রভাসে প্রাপ্ত নিদর্শনের অধিকাংশই চলে গিয়েছে জুনাগড়, জামনগর, বম্বে ও কলকাতার মিউজিয়ামে।"

টাকা যখন দিতেই হবে, তখন প্রশ্ন করা যাক্। জিজ্ঞেস করি, "প্রভাসে মোট কতগুলো শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে?"

"উনআশিটি।"

"কোন্ কোন্ সময়ের?"

"সেগুলো সবই ১১২০ থেকে ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত।"

"কোন্ কোন্ ভাষায় লেখা?"

"ব্রাহ্মী অথবা সংস্কৃতে তিপান্নখানি আর আরবী, পার্শী অথবা উর্দুতে ছাব্বিশখানি। বারোখানিতে কোন তারিখ লেখা নেই, তার মধ্যে সাতখানি সংস্কৃত।"

"এই শিলালিপি ক'খানাই তো প্রভাসের প্রাচীন ইতিহাসের বনিয়াদ?"

"তা বলতে পারেন।"

"আচ্ছা, মহারাজা কুমারপালের মন্দিরের আগে সোমনাথে ক'টি মন্দির তৈরি হয়েছিল?"

"তিনটি।"

"কবে এবং কারা সেগুলো তৈরি করেছিলেন?"

"দেখুন, সবই আনুমানিক সিদ্ধান্ত। তবে একদল ঐতিহাসিকের মতে—সোমনাথে প্রথম মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, সোম নামে জনৈক যাদববংশীয় রাজা খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে। সে মন্দিরটি নাকি সোনা দিয়ে তৈরি ছিল।

"তাঁদের মতে—দ্বিতীয় মন্দিরটি তৈরি করেন রাজা কৃষ্ণরাজ,

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে। আর সম্রাট দ্বিতীয় নাগ ভট্ট ৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় মন্দিরটি নির্মাণ করেন। সেটি ছিল পাথরের।

"তাঁদের এই সিদ্ধান্তের মূলে ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দের একখানী 'ভদ্রকালী' শিলালিপি। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি সোনা ও রূপার মন্দির বিশ্বাস করি না। আমার ধারণা সে-দুটি সোনালী ও রূপোলী রঙের মন্দির ছিল।"

"একটা কথা···" আমি বাধা দিই।

গাইড বলে, "বেশ, বলুন।"

"আপনি বললেন, প্রথম মন্দিরটি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে নির্মিত হয়েছিল কিন্তু আমি শুনেছি সোমনাথে প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ ও মন্দির নির্মাণ করেন চাণক্য। তিনি তো খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের মানুষ।"

"হ্যাঁ। একদল ঐতিহাসিক তাই বলেন। এবং তাঁদের মত অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য!" তাঁরা বলেন — দ্বিতীয় মন্দির তৈরি হয় ৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। তৃতীয় মন্দির নির্মিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় ৮০০ সালে আর চতুর্থ ৯৫৫ থেকে ১০৭৫ সালের মাঝে কোন সময়ে। সুলতান মাহ্‌মুদ সেই মন্দির ধ্বংস করেন। পঞ্চম মন্দির তৈরি করেন কুমারপাল ১১৬৯ সালে এবং পরবর্তী কালের সম্রাট সুলতানরা বার-বার সেটির ওপর হামলা চালিয়েছেন। রানী অহল্যাবাঈ ষষ্ঠ মন্দির তৈরি করেন ১৭৮৩ সালে। আর ১৯৬৫ সালের মে মাসে নির্মিত হয়েছে ভারত সরকারের মহামেরু প্রাসাদ — সোমনাথের সপ্তম মন্দির।" গাইড থামে একবার। বলে, "চলুন, এবারে মিউজিয়াম দেখা যাক্।"

তার সঙ্গে ভেতরে ঢুকি। ছোট যাদুঘর। দেওয়ালের সঙ্গে কয়েকটি টেবিল ও আলমারীতে কয়েকপ্রস্ত নিদর্শন এবং কোনটিই অক্ষত নয়।

প্রথম প্রস্তের সামনে এসে গাইড বলে, "এগুলো চালুক্যরাজ শ্রীমূলরাজদেব সোলাঙ্কি কর্তৃক পুনর্নির্মিত সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ — খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর নিদর্শন।"

দেখা শেষ করে গাইডের সঙ্গে দ্বিতীয় প্রস্তের সামনে আসি।

একই ধরনের নিদর্শন। গাইড বলে, "এগুলো সবই খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে নির্মিত প্রভাসের বিভিন্ন জৈন-মন্দির ও সপ্ত-মাতৃকা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।…আর ঐযে ওপাশে নিদর্শনগুলো দেখছেন, ওগুলিও একাদশ শতাব্দীর—দৈত্যসূদন মহাবিষ্ণু মন্দিরের অংশ।"

কয়েকপা হেঁটে আমরা পরের সারির সামনে আসি। গাইড জানায়, "একাদশ শতাব্দীতে চালুক্যরাজ ভীমদেব ও অন্যান্য রাজাদের দ্বারা পুনর্নির্মিত সোমনাথ মন্দিরের ভগ্নাংশ।"

দেখা শেষ হলে তার সঙ্গে শেষ প্রস্থের সামনে আসি। সে বলে, "এই নিদর্শনগুলো একটু ভাল করে দেখবেন। এগুলো ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত কুমারপালের সোমনাথ মন্দির থেকে সংগৃহীত।"

ভাল করে দেখার অবকাশ কোথায় আমায়? আমি যে কণ্ডাক্টেড ট্যুরে এসেছি। ম্যানেজারের মঞ্জুর করা আধঘণ্টা সময় বিগত হয়েছে বহুক্ষণ। এতক্ষণে টাঙ্গাওয়ালারা তাগিদ দিচ্ছে, ম্যানেজার অধীর আগ্রহে পায়চারি করছে আর সহযাত্রীরা…

থাক্, তাঁদের কথা ভেবে সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি তাঁদের কাছেই ফিরে যাওয়া যাক্।

বেরিয়ে আসি মিউজিয়াম থেকে। গাইডও আমার সঙ্গে পথে নামে। তার পারিশ্রমিক দেওয়া হয় নি, এবারে দিতে হবে।

কিন্তু কত দেবো? ছেলেটি বেশ অমায়িক ও বুদ্ধিমান। বেশ লেখা-পড়া জানে। অনেক কিছু জানতে পারলাম ওর কাছে। ওকে না পেলে এত অল্প সময়ে এভাবে মিউজিয়াম দেখা সম্ভব হতো না আমার পক্ষে। পাঁচ-টাকা বোধহয় একটু কম হয়ে যাবে। তাহলেও তাই দেওয়া যাক্। আপত্তি করলে, দেখা যাবে।

পাঞ্জাবির পকেট থেকে পাঁচটাকার একখানি নোট বের করে আমি গাইডের দিকে হাত বাড়াই। মুখে বলি, "অনেক ধন্যবাদ।"

"টাকা!" ছেলেটি ধমক দিয়ে ওঠে, "টাকা দিচ্ছেন কেন?"

রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। তবু কোনমতে বলি, "মানে আপনার পারিশ্রমিক।"

"পারিশ্রমিক !"

"হ্যাঁ। মানে গাইডের ফি ?"

"গাইড···" শেষ করে না সে। হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতেই বলে, "আপনি বুঝি আমাকে 'প্রফেস্যনাল গাইড' ভেবেছেন। না, স্যার। আমি গাইড নই, আমি এই মিউজিয়ামের একজন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ কিউরেট্যার।"

"মাফ করবেন আমাকে।" আমি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ছেলেটি তাড়াতাড়ি আমার হাত দু'খানি ধরে নিজের দু'হাতের মধ্যে নেয়। সবিনয়ে বলে, "আমাকে অপরাধী করবেন না।"

আমি বলি, "নিতান্ত অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও আজ আপনার কাছ থেকে যে ব্যবহার পেলাম, তা বহুদিন মনে থাকবে। আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ জানাব, ভেবে পাচ্ছি না।"

"অপরিচিত হলেও আপনি যে আমার জন্মভূমি কলকাতা থেকে এসেছেন। আপনি আমার আত্মীয়, আমার দাদা। তাই তো হাতের কাজ ফেলে আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করলাম। ধন্যবাদ নয়, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন দাদা !"

আমি কিছু বুঝতে পারার আগেই ছেলেটি সহসা নত হয়ে প্রণাম করে আমাকে।

দু'হাতে তাকে টেনে তুলে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরি।

॥ দশ ॥

ভালকা তীর্থের সামনে এসে টাঙ্গা থামল। ভেরাভল ও প্রভাসের মধ্যপথে অবস্থিত এই তীর্থ। এটি প্রভাসের পূর্বাঞ্চল। প্রভাস যাবার পথে আমরা টাঙ্গায় বসে দেখেছি এই তীর্থ। তখন ভেতরে যাই নি, এখন যাবো।

রোদ পড়ে এসেছে, একটু বাদেই সন্ধ্যা হবে। সুতরাং টাঙ্গা থেকে নেমে তাড়াতাড়ি তোরণের দিকে এগিয়ে চলি। আওরঙ্গজেবের ধ্বংসলীলার পর থেকে এই পুণ্যক্ষেত্র মন্দিরহীন হয়ে ছিল। মাত্র বছর সাতেক আগে সোমনাথ ট্রাস্ট মন্দিরটি তৈরি করে দিয়েছেন।

তোরণ ছাড়িয়েই বাঁদিকে বাঁধানো জলাশয়—ভালকা কুণ্ড। শুক্লা দ্বাদশীতে এই কুণ্ডে অবগাহন করলে নাকি অক্ষয় স্বর্গবাস। আজ যেমন শুক্লা দ্বাদশী নয়, তেমনি এখন নেই অবগাহনের অবকাশ। সুতরাং আমার পুণ্যকামী সহযাত্রীদের পুণ্যকুণ্ডের পুণ্যবারি স্পর্শ করেই পুণ্যতৃষ্ণা মেটাতে হয়।

কুণ্ড পেরিয়ে কয়েক পা হেঁটে মন্দির। আধুনিক ডিজাইনের সুদৃশ্য মন্দির। সামনে স্তম্ভযুক্ত খোলা বারান্দা। সিঁড়ির দু'পাশের স্তম্ভ দুটি শ্বেতপাথরের। তাদের গায়ে খোদাই কাজ। সিঁড়ির অংশটা অনেকটা গাড়ি-বারান্দার মতো। চূড়াটি মেট্রো ডিজাইনের। সেখানে একটি সূর্য অঙ্কিত। তার নিচে গুজরাতীতে লেখা রয়েছে—

'২০২৩* শ্রীভালকা তীর্থ মন্দির ১৯. ৫. ৬৭

শ্রীসোমনাথ ট্রাস্ট।'

কয়েক ধাঁপ সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরে উঠে আসি। শ্বেতপাথরের মসৃণ মেঝে। আমরা এগিয়ে চলি। মন্দিরের মধ্যে একটি ছোট্ট অশ্বত্থ গাছ। তারই পাশে দেয়ালের সঙ্গে এক সুদৃশ্য মঞ্চে অর্ধ-

* বিক্রম সংবৎ

শায়িত শ্রীকৃষ্ণ। শ্বেতপাথরের মানুষ-সমান মূর্তি। ভারী সুন্দর চতুর্ভুজ মূর্তি। পরনে পীতবাস। মণিবন্ধ ও বাহুতে অলঙ্কার। গলায় মালা, মাথায় মুকুট আর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। বিষ্ণুরূপী কৃষ্ণ — যেমন জীবন্ত তেমনি অপরূপ, চোখ ফেরানো যায় না। প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এই কৃষ্ণ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন।

কৃষ্ণের পদতল বাণবিদ্ধ। কিন্তু তাঁর চোখে মুখে নেই কোন যন্ত্রণার চিহ্ন। বরং তার মুখমণ্ডল পরম প্রশান্ত। চোখ দুটি থেকে ঝরে পড়ছে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি! তিনি সহাস্য বদনে তাকিয়ে রয়েছেন জরা ব্যাধের দিকে।

নরনারায়ণের পায়ের কাছে, একটু নিচে জরা ব্যাধ হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে। তার মাথায় পটি বাঁধা, পিঠে তূণ, পাশে ধনুক। দু'হাত জড়ো করে সে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করছে। আমিও কৃপা প্রার্থনা করি, তাঁকে প্রণাম করি। তারপরে আবার স্মরণ করি সেই পুণ্যকাহিনী —

শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব লীলা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে মৌষল লীলায় যদুনাথ নিজেই যদুবংশ ধ্বংস করলেন। গান্ধারীর অভিশাপ সত্য হল। তারপরে শ্রীকৃষ্ণ গেলেন সাগরতীরে। দেখলেন ধ্যানমগ্ন বলরাম আত্মাতে আত্মা সংযোগ করে মর্তলোক ত্যাগ করছেন।

শ্রীকৃষ্ণ তখন পাশের বনে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পায়চারী করার পরে তিনি এলেন এখানে। একটি অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় বসে পড়লেন। ধারণ করলেন চতুর্ভুজ মূর্তি। তাঁর রূপের ছটায় দশদিক উদ্ভাসিত হল।

জরা নামে জনৈক ব্যাধ দূর থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে তাঁর পা দু'খানি দেখতে পেল। সে হরিণ ভেবে শরসন্ধান করল। শ্রীকৃষ্ণের পদতল বাণবিদ্ধ হল। দুর্বাসার আদেশ অমান্য করবার জন্যই ঘটল এই দুর্ঘটনা। মহামুনি দুর্বাসা একবার দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের আতিথ্য

গ্রহণ করে রুক্মিণীকে পরমান্ন রাঁধতে বলেছিলেন। কিন্তু রান্না হয়ে যাবার পরে, দুর্বাসা সে পরমান্ন নিজে না খেয়ে শ্রীকৃষ্ণকে গায়ে মাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতিথিবৎসল শ্রীকৃষ্ণ সেই অদ্ভুত আদেশ পালন করেও পায়ের পাতায় পরমান্ন মাখেন নি। আর তা মাখেন নি বলেই ব্যাধ তাঁর পদতলে বাণবিদ্ধ করতে সমর্থ হল।

ব্যাধ ছুটে এলো শিকারের কাছে। সবিস্ময়ে দেখল হরিণ নয়, শ্রীহরি। সে পুরাণপুরুষকে বাণবিদ্ধ করেছে। কান্নায় ভেঙে পড়ে ব্যাধ, সে পতিতপাবনের রক্তাক্ত পদযুগল বুকে জড়িয়ে ধরে।

স্নিগ্ধস্বরে শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনা দিলেন — ব্যাধ তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ করেছো — 'কাম এষ কৃতো হি মে।' তুমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। কারণ তুমি আমারই মায়ায় আমাকে শরাঘাত করেছো। পূর্ব অবতারে তুমি ছিলে বালিপুত্র অঙ্গদ। তোমার বীর পিতাকে আমি চোরাবাণে বধ করেছিলাম। তারপরে তুমি আমার কাছে পিতৃহন্তাকে হত্যা করবার বর প্রার্থনা করেছিলে। আমি বলেছিলাম — 'তথাস্তু'।

— আমার সেই বরে তুমি আজ চোরাবাণে আমাকে বধ করে আমার অভিলাষ পূর্ণ করলে। তাই আজ আমি আবার তোমাকে বরদান করছি — তুমি সুকৃতিদের প্রাপ্যস্থান স্বর্গে গমন কর — 'যা হি ত্বং মদনুজ্ঞাতং স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্'।

আজ্ঞা লাভ করে জরা ব্যাধ তিনবার শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করলেন। তারপরে বিমানযোগে স্বশরীরে স্বর্গে চলে গেলেন।

আর ঠিক তখুনি স্বর্গ থেকে ব্রহ্মা, শিব এবং দুর্গার সঙ্গে অন্যান্য দেব-দেবীরা এখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা আহত কৃষ্ণকে এখান থেকে প্রভাসে অর্থাৎ সরস্বতী-সাগর সঙ্গমে বয়ে নিয়ে গেলেন।

প্রভাসে পৌঁছে শ্রীকৃষ্ণ আত্মস্বরূপে মনঃসংযোগ করলেন — 'সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানাং।' তিনি তাঁর পদ্মনয়ন দুটি নিমীলিত করে ধ্যানস্থ হলেন। অনতিকাল পরেই শ্রীকৃষ্ণ স্বশরীরে স্বর্গে চলে গেলেন। তাঁর সেই স্বার্গারোহণ লীলা দেব-দেবীরা পর্যন্ত দেখতে পেলেন না।

সেই পুণ্যকাহিনীর প্রেক্ষাপটে এই পুণ্যক্ষেত্রে নির্মিত হয়েছে মন্দির — ভালকা তীর্থ মন্দির। এই তীর্থ দর্শন করে আজ আমার জীবন ধন্য হল।

পুণ্যতীর্থ-প্রভাস পরিক্রমাও পূর্ণ হল আমার। এতো শুধু প্রভাস পরিক্রমা নয়, বিশ্ব ইতিহাসের মহত্তম মহামানবের মহাজীবন পরিক্রমা। পাঁচ বছর আগে এক শীতের সকালে মথুরা থেকে যে যাত্রা শুরু করেছিলাম, আজ এই বাসন্তী বিকেলে প্রভাসে তা শেষ হল। সেদিন ভাবতে পারি নি আমার স্বপ্ন সফল হবে। আজ বুঝতে পারছি তাঁরই করুণায় আমার এ কামনা পূর্ণ হল। সকৃতজ্ঞ চিত্তে আমি তাই করুণাময় কৃষ্ণকে পুনরায় প্রণাম করি।

পুণ্যার্থীদের সঙ্গে বেরিয়ে আসি ভালকা তীর্থ থেকে। টাঙ্গার কাছে আসতেই বিউটির গলা কানে আসে। সে সরকারদার পাশে বসে ডাকছে আমাকে। বলছে, "মামু! আপনি এই টাঙ্গায় আসুন।"

আমি কিছু বলতে পারার আগেই দাদা বলে ওঠেন, "তাই ভাল। মামু ঐ টাঙ্গায় যাক্ আর তুমি আমার টাঙ্গায় এসো।"

"দাদু! ভাল হবে না বলছি।"

"তুমি আমার পাশে না এলে, ভাল হবে কেমন করে?"

এবারে আর হাসি চাপা সম্ভব হয় না। আমরা সোচ্চারস্বরে হেসে উঠি। দাদা আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন কিন্তু বিউটি গম্ভীর।

একটু বাদে দাদা বলেন, "থাক্‌গে ভাই। তুমি ঐ টাঙ্গাতেই যাও, নইলে আবার আমার গিন্নী ক্ষেপে যাবে। দাম্পত্য কলহ বড়ই কষ্টকর।"

আমি হাসতে হাসতে বিউটির টাঙ্গায় উঠে আসি। টাঙ্গা এগিয়ে চলে — পুণ্যতীর্থ-প্রভাস থেকে ভেরাভলের পথে।

গোধূলি নেমে এসেছে প্রভাসের পথে পথে। সেদিনও বোধকরি

প্রভাস এমনি আঁধারে ঢেকে গিয়েছিল, যেদিন কৃষ্ণ সাঙ্গ করেছিলেন তাঁর মর্তলীলা। তারপরে বিষাদের আঁধারে ঢাকা প্রভাসে এসেছিলেন অর্জুন। আর এই কাহিনী শোনাবার জন্যই বিউটি আমাকে সরকারদার টাঙ্গায় তুলেছে। মহাভারতের সেই কাহিনী শুনতে শুনতে আমরা বিদায় নিচ্ছি প্রভাসের কাছ থেকে।

সরকারদা বলে চলেছেন, "সকালে আমি মৌষল পর্বের শেষাংশ খুব সংক্ষেপে বলেছি। এবারে বিস্তৃত বিবরণ দিচ্ছি।"

আমরা মাথা নাড়ি। সরকারদা বলতে থাকেন, "দেহত্যাগের আগে অর্জুনকে নিয়ে আসবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ দারুককে হস্তিনায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দারুকের সঙ্গে সব্যসাচী ছুটে এলেন দ্বারকায়। অপরূপা দ্বারাবতীকে তাঁর অনাথা রমণীর মতো মনে হল। অর্জুনকে দেখতে পেয়েই শ্রীকৃষ্ণের মহিষীরা হাহাকার করতে থাকলেন। পতি-পুত্রহীনা নারীদের আর্তনাদ শুনে অর্জুনের চোখদুটিও জলে ভরে উঠল। তাঁর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। বীরশূন্যা দ্বারাবতীকে তাঁর যমালয়ের বৈতরণী নদী বলে মনে হতে থাকল। কৃষ্ণের মহিষীরা যেন সেই নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে হেমন্তের ম্লান পদ্মের মতো ভেসে বেড়াচ্ছেন। অর্জুন দ্বারকার দুর্দশা আর বেশিক্ষণ সইতে পারলেন না। তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। রুক্মিণী, সত্যভামা ও জাম্ববতীসহ শ্রীকৃষ্ণের রানীরা তাঁকে ঘিরে কান্না জুড়ে দিলেন।

"কিছুক্ষণ বাদে অর্জুনের জ্ঞান ফিরে এলো। তিনি মনে মনে বাসুদেবের স্তব করে শক্তি সঞ্চয় করলেন। তারপরে রুক্মিণীদের সান্ত্বনা দিয়ে বসুদেবের কাছে এলেন। বসুদেব অর্জুনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন — ধনঞ্জয়, যারা অসংখ্য ভূপতি ও দানবদের পরাজিত করেছিল, তাদের না দেখেও আমি আজ জীবিত রয়েছি। যে প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে তুমি প্রিয়-শিষ্য বলে সর্বদা প্রশংসা করতে, তাদেরই দুর্নীতির ফলে যদুবংশ ধ্বংস হয়েছে। অবশ্য তাদের আর কি দোষ বল, সতীশাপ ও ব্রহ্মশাপের

জন্যই এমনটি হয়েছে। যে কৃষ্ণ কেশীদৈত্য, কংস ও শিশুপালকে অক্লেশে বধ করেছে, সে সচক্ষে জ্ঞাতিবধ দেখেও কোন প্রতিকার করে নি।

"পুত্র ও পৌত্র শোকাতুর বসুদেব সেদিন অর্জুনের কাছে আরও অনেক বিলাপ করেছিলেন। বলেছিলেন — যে কৃষ্ণ তোমার পৌত্র পরীক্ষিৎকে পুনর্জীবিত করেছিল, সে তার নিজের পৌত্রদের রক্ষা করে নি। সে কেবল আমার কাছে এসে বলল — বাবা, আজ যদুকুল নিঃশেষিত হল। আমি অর্জুনকে আনবার জন্য দারুককে পাঠিয়েছি। অর্জুন ও আমার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। সে-ই আপনাদের শ্রাদ্ধাদি সুসম্পন্ন করবে। বৃদ্ধ, শিশু ও নারীদের রক্ষা করবে। সে এখান থেকে চলে যাওয়ামাত্র দ্বারকাপুরী সমুদ্রজলে প্লাবিত হবে।

"একটু থেমে বসুদেব আবার অর্জুনকে বললেন — এই রাজ্য রাজভাণ্ডার ও যাদবনারীরা সবই এখন তোমার। তুমি তাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা কর।

"অর্জুন তখন দারুকের সঙ্গে বৃষ্ণিবংশীয় অমাত্যদের কাছে এলেন। তিনি তাঁদের বললেন — আমি অন্ধকদের পরিবারবর্গকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে চলে যাচ্ছি। কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রনাভ এই রাজ্যের রাজা হবে। সাতদিন পরে দ্বারকা প্লাবিত হবে। সুতরাং সপ্তম-দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দ্বারকা ত্যাগ করব। তোমরা ধনরত্ন ও নারীদের নিয়ে প্রস্তুত হও।

"পরদিন প্রভাতে প্রবলপ্রতাপ মহাত্মা বসুদেব যোগ অবলম্বন করে দেহত্যাগ করলেন। অর্জুনের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা সহকারে তাঁর মৃতদেহ মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। বসুদেবের চার স্ত্রী — দেবকী, রোহিণী, ভদ্রা ও মদিরা দিব্য অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় সহমরণ বরণ করলেন।

"তারপরে অর্জুন এলেন এখানে — এই প্রভাসে। তিনি বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের মৃতদেহ খুঁজে বের করে শেষকৃত্য সুসম্পন্ন করলেন।

আপনাদের আগেই বলেছি, শ্রীমদ্ভাগবতের মতে শ্রীকৃষ্ণ স্বশরীরেই স্বর্গে গমন করেন কিন্তু মহাভারতে বলা হয়েছে— রাম-কৃষ্ণের মৃতদেহ খুঁজে বের করে অর্জুন সৎকার করেছিলেন।"

"আমরা কোন মতটি বিশ্বাস করব?" উমাদি প্রশ্ন করেন।

সরকারদা বোধহয় মুশকিলে পড়েছেন। তিনি একটুকাল চুপ করে থেকে বলেন, "ভক্তরা ভাগবতের মত মেনে নেবেন। আর যাঁরা ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাঁরা মানবেন মহাভারতের কথা।"

"আরেকটা কথা", বৌদি বলেন, "কৃষ্ণ কত বছর বয়সে মর্তলীলা সংবরণ করেছেন?"

সরকারদার আগে আমি উত্তর দিই, "আধুনিক গবেষকদের মতে কৃষ্ণের বয়স তখন তিরানব্বই।"

"কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় তাহলে কৃষ্ণার্জুনের বয়স ছিল সাতান্ন বছর!"

আমি মাথা নাড়ি।

"ও কাকু! তারপরে কি হল?" বিউটি গবেষণায় উৎসাহী নয়, সে গল্প শুনতে চায়। সুতরাং ষোড়শী শ্রোতৃ ধৈর্যহীনা।

সরকারদা শুরু করেন, "তারপরে অর্জুন রথ, গরুর গাড়ি ও উটের পিঠে দ্বারকার সমস্ত শিশু, বৃদ্ধ, নারী ও ধনরত্ন নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের পথে রওনা হলেন। তাঁরা দ্বারকা ত্যাগ করা মাত্র সমুদ্র সেই সুরম্য মহানগরীকে গ্রাস করে ফেলল। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা হারিয়ে গেল চিরকালের মতো। দ্বারকাধীশের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হল।

"কয়েকদিন পরে অর্জুন সদলবলে পঞ্চনদের দেশে উপস্থিত হলেন। সেখানে আভীর দস্যুরা লাঠি হাতে তাঁদের আক্রমণ করল। সব্যসাচী অতিকষ্টে শরাসনে জ্যারোপণ করলেন, কিন্তু কিছুতেই দিব্যাস্ত্রদের নাম মনে করতে পারলেন না। ফলে ধনঞ্জয়ের সামনেই তারা ধনরত্ন ও সুন্দরী যুবতীদের লুঠ করতে থাকল। কোন কোন যুবতী আবার স্বেচ্ছায় দস্যুদের কণ্ঠলগ্না হল।

"অবশিষ্ট ধনরত্ন ও নর-নারীদের নিয়ে অর্জুন কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তিনি সাত্যকির ছেলেকে সরস্বতী নগরে এবং ভোজবংশীয়-

দের মার্তিকাবত নগরে পাঠিয়ে দিলেন। বজ্রনাভসহ অন্যান্যদের নিয়ে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলেন। অক্রুরের পত্নীরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমা ও জাম্ববতী প্রভৃতি জহরব্রত পালন করলেন। সত্যভামা ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীরা তপস্যা করবার জন্য হিমালয় অতিক্রম করে কলাপগ্রামে চলে গেলেন।

"তারপরে অর্জুন বজ্রনাভকে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে বসিয়ে নিজে ব্যাসদেবের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। মহর্ষি বেদব্যাস ধনঞ্জয়ের চেহারা দেখে আঁতকে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন — বৎস, তোমাকে এমন শ্রীহীন দেখছি কেন? তুমি কি ব্রহ্মহত্যা কিংবা রজঃস্বলাগমন করেছ? অথবা কেউ তোমাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছে?

"পার্থ উত্তর দিলেন — ভগবন্! সেই নবজলধরসদৃশ নীল-কলেবর পঙ্কজলোচন পীতাম্বর এবং বলদেব মর্তলীলা সাঙ্গ করে স্বর্গে গমন করেছেন। যদুবংশ ধ্বংস হয়েছে। যে পদ্মপলাশলোচন শঙ্খ-চক্র-গদাধর শ্যামতনু পরমপুরুষ আমার রথের সামনে বসে থাকতেন, আমি আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমি যে ভাবতেই পারছি না, তার সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হবে না। তাঁকে ছাড়া যে আমার পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব। আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না।

"মহর্ষি বেদব্যাস অর্জুনকে সান্ত্বনা দান করে শান্তস্বরে বললেন — অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়রা নিজেদের পাপে ব্রহ্মশাপে বিনষ্ট হয়েছেন। কাজেই তাঁদের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়। তাঁদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বলেই বাসুদেব তাঁদের বাঁচাবার চেষ্টা করেন নি। নইলে তিনি ইচ্ছে করলে ব্রহ্মা-শাপ খণ্ডন তো দূরের কথা, এই স্থাবর জঙ্গম বিশ্বসংসারকে অন্যরূপে তৈরি করতে পারেন। ভূভার লাঘবের জন্যই তিনি বসুদেবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তোমাকে ভালবাসতেন বলেই তিনি তোমার সারথি হয়েছিলেন। এখন পৃথিবী পাপীমুক্ত, ধর্মযুদ্ধে ধর্ম হয়েছে জয়যুক্ত, তাই তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করেছেন।

"— তুমি এবং ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের সাহায্যে এতকাল কৃষ্ণের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করেছ। অতএব তাঁর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে। তোমাদেরও এখন ইহলোক ত্যাগ করা উচিত।

"একবার থামলেন ব্যাসদেব। অর্জুন তাকালেন তাঁর দিকে। কিন্তু তিনি কোন কথা বলতে পারার আগেই ব্যাসদেব আবার তাকে বলতে থাকলেন — মানুষের সময় ভাল হলে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, তেজ ও সুবুদ্ধি — সবই তার সহায় হয়, আবার সময় খারাপ হলে সে দুর্বুদ্ধির তাড়নায় দুর্বল ও দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ে। কারণ কালই জগতের বীজস্বরূপ। তোমার অস্ত্রশস্ত্রের কার্যকালও শেষ হয়েছে। তারা যেখান থেকে এসেছিল, সেখানেই ফিরে গিয়েছে। তাই সেদিন তুমি সামান্য দস্যুদের দমন করতে পারো নি।

"কেবল তোমার অস্ত্রশস্ত্র নয়, তোমার এবং তোমার ভাইদের কার্যকালও শেষ হয়ে গিয়েছে, স্বর্গারোহণের সময় হয়েছে সমাগত। সুতরাং তুমি হস্তিনাপুরে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে সব কথা বল। তারপরে পরীক্ষিতের হাতে রাজদণ্ড দিয়ে দ্রৌপদীকে নিয়ে তোমরা পাঁচভাই মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করো।"

॥ এগারো ॥

'হরিগুণ গারত নাচুংগী ॥
অপনে মংদিরমেঁ বৈঠ বৈঠকর
গীতা ভাগবত বাচুংগী ॥
গ্যান ধ্যানকী গঠরী বাঁধ কর
হরিজন সংগ মৈঁ লাগুংগী ॥
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর
সদা প্রেমরস চাখুংগী ॥'

উমাদির গানে ঘুম ভেঙে যায়। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর গোপালকে ঘুম থেকে তুলছেন আর মীরার ভজন গাইছেন। হয়তো বা মনে মনে মীরার মতই ভাবছেন — আমি এবার হরিগুণ গেয়ে গেয়ে নাচব আর আমার মন্দিরে বসে গীতা ও ভাগবত পাঠ করব। জ্ঞান ও ধ্যান হবে আমার সম্পদ আর হরিজন হবে আমার সঙ্গী। হে মীরার প্রভু গিরিধর নাগর, আমি প্রতিদিন তোমার প্রেমরস আস্বাদন করব।

গানের রেশ কেটে যেতেই উঠে বসি। জানলা খুলি। এযে দেখছি গাড়ি সাইডিংয়ে ফেলে রেখেছে। তাই তো রাখবে। ভেরাভল থেকে আমেদাবাদ যাবার মাত্র একখানি থ্রু ট্রেন — সোমনাথ মেল। বিকেল সাড়ে তিনটায় ভেরাভল থেকে রওনা হয়ে পরদিন সকাল সওয়া ছ'টায় আমেদাবাদ পৌছয়। আবার রাত সাড়ে ন'টায় আমেদাবাদ ছেড়ে পরদিন বেলা সাড়ে বারোটায় ভেরাভল আসে।

কিন্তু সে-ট্রেন আমাদের জন্য নয়। সোমনাথ মেলয়ের সঙ্গে ট্যুরিস্ট কোচ্ জুড়বার নিয়ম নেই। অতএব দু'জায়গায় ট্রেন বদল করে আমাদের আমেদাবাদে পৌছতে হবে।

গতকাল সন্ধের পরে আমাদের ট্রেন ছেড়েছে ভেরাভল থেকে। রাত বারোটা নাগাদ আমরা জীতলসর জংশনে এসেছি। সেখানে ওখা-ভবনগর প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে আমাদের গাড়ি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। রাত সাড়ে বারোটায় ট্রেন ছেড়েছে। ভোর সাড়ে চার-টায় এই ঢোলা জংশনে এসেছি। সেই থেকে গাড়ি ফেলে রেখেছে এখানে। বেলা এগারোটার আগে এখান থেকে আমেদাবাদের কোন ট্রেন নেই।

বেড-টি পরিবেশন করার পরেই ঠাকুর তার দলবল ও বাসনপত্র নিয়ে প্লাটফর্মে চলে গেল — কাছেই প্লাটফর্ম। সেখানে গাছের ছায়া ও জলের কল আছে। সুতরাং ওখানে বসে রান্না ও খাবারের হাঙ্গামা মেটানো সহজতর। ম্যানেজার বলেছে, গাড়ি ছাড়ার আগেই খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলবে।

এখান থেকে বেলা এগারোটায় গাড়ি ছাড়লে আমরা বিকেল ছ'টায় আমেদাবাদে পৌঁছব। অর্থাৎ ভেরাভল থেকে আমেদাবাদ এই ৪৫৯ কিলোমিটার পথ যেতে আমাদের মোট তেইশ ঘণ্টা সময় লাগবে। অথচ এই পথটুকু অতিক্রম করতে সোমনাথ মেলয়ের মাত্র পনেরো ঘণ্টা সময় লাগে। আর রাজধানী এক্সপ্রেসের ?…থাক্ সে কথা মনে না করাই ভাল।

আজ তীর্থদর্শনের তাগিদ নেই। সুতরাং সহযাত্রীরা অনেকেই বেড-টি খেয়ে বাথরুম সেরে আবার এসে শুয়ে পড়েছেন। বলা বাহুল্য তাঁদের তালিকায় যেমন উমাদির নাম নেই, তেমনি নেই ঠাকুরমাদের নাম। তাঁরা যথারীতি বাসি-কাপড়ের বালতি নিয়ে স্টেশনের দিকে চলে গিয়েছেন।

শুয়ে থাকার উপায় নেই আমারও। গতকাল সারাদিনে ডায়েরী লেখা হয় নি। আজ লিখে ফেলতে হবে এবং সহযাত্রীরা মজলিশ শুরু করবার আগেই কাজটা সেরে ফেলা উচিত হবে। ম্যানেজার আমার লেখক পরিচয় জেনে ফেলেছে। কিন্তু সে কথা রেখেছে, কাউকে প্রকাশ করে নি। তাহলেও অনেকেই সন্দেহ করতে শুরু করেছেন,

যেমন উমাদি, কল্পনাদি, সত্যেনদা ও সরকারদা। ডায়েরী লিখতে বসলেই ওঁরা আড়চোখে আমার দিকে নজর রাখেন। কাজেই যতটা আড়ালে কাজ সারা যায়, ততই ভাল।

লিখতে বসেই ওর কথা মনে পড়ে আমার—মানসীর কথা। তার কাছেও একখানি চিঠি লিখে রাখতে হবে, আমেদাবাদ পৌঁছে ডাকে দিয়ে দেব।

আচ্ছা, লিখি নি লিখি নি করেও তো গত দু'সপ্তাহে আমি ওর কাছে খানচারেক চিঠি লিখেছি। কিন্তু আমি যে ওর একখানা চিঠিও পেলাম না। অথচ সেদিন আগ্রা ফোর্ট স্টেশনে সে বলে গিয়েছিল—পাত্রপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আমাকে সে বিয়ের তারিখ জানিয়ে দেবে মাউণ্ট-আবু কিংবা দ্বারকার ঠিকানায়।

সামনে চৈত্র মাস। ফাল্গুন মাসের আর ক'দিনই বা বাকী আছে। তাহলে কি কোন কারণে শেষ পর্যন্ত খুকুর বিয়ে ভেঙ্গে গেল! আর তাই মানসী এমন নীরব!

কিন্তু আমি এখন কি করি? আমাদের গাড়ি আমেদাবাদ থেকে ডাকোর যাবে। সেখান থেকে বম্বে, নাসিক ও অজন্তা-ইলোরা হয়ে কলকাতায় ফিরবে। কাজেই ফাল্গুন মাসে খুকুর বিয়ে হলে আমাকে আমেদাবাদেই সহযাত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে, রওনা দিতে হবে বৃন্দাবনের পথে।

আচ্ছা. আজ কত তারিখ? পনেরো নয়? ডায়েরী দেখি। হ্যাঁ আজ যে পনেরো তারিখ। কিন্তু শঙ্করীদের তো ষোল তারিখে আমেদাবাদে আসতে বলা হয়েছে। এই যে আমার ডায়েরীতে স্পষ্ট লেখা আছে, আমরা আগামীকাল আমেদাবাদে পৌঁছব। শঙ্করীরা কাল সকালে আবু-রোড থেকে রওনা হয়ে বিকেলে আমেদাবাদে আসবে। ম্যানেজার নিজে হিসেব করে ওদের সব বলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমরা ওদের নিয়ে কাল রাতেই ডাকোর রওনা হব।

ম্যানেজার আমার ওপরের বাঙ্কে শুয়ে রয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করি কথাটা।

কথাটা তারও খেয়াল হয়েছে। তাই সে চিন্তিত কণ্ঠে বলে, "সত্যিই সেদিন হিসেবে একটু ভুল হয়ে গেছে ঘোষদা! যেভাবে ট্রেন লেট হচ্ছিল, তাতে ভাবতেই পারি নি ষোল তারিখের আগে আমেদাবাদ পৌছতে পারব। তাই আমি ওনাদের ষোল তারিখে আসতে বলেছিলাম।"

"আচ্ছা, আমরা কি আমেদাবাদে একটা দিন অপেক্ষা করতে পারি না?"

"না। আমেদাবাদে 'ব্রেক জার্নি' নেই। রেল কর্তৃপক্ষ আমাদের থাকতে দেবেন না সেখানে।"

পাঁচু আমার শেষ আশা নির্মূল করে দেয়, তবু বলি, "কিন্তু ওরা যে কাল এসে বড়ই মুশকিলে পড়বে তাহলে।"

"মুশকিলে পড়বেন কেন?" ম্যানেজার মুশকিল আসান করে, "প্রথম কথা ওনারা যে আসবেনই, তার কোন মানে নেই। আবু-রোড থেকেও কলকাতায় চলে যেতে পারেন। যদি তা না গিয়ে থাকেন এবং যদি তাঁরা কাল এখানে আসেন, তাহলে যাতে ওঁরা নির্বিঘ্নে বম্বে চলে যেতে পারেন, আমি আমেদাবাদে সে-ব্যবস্থা করে যাবো। বম্বে ছাড়তে এখনও আমাদের চারদিন বাকী। তার মধ্যে নিশ্চয়ই ওঁরা বম্বে পৌছে যাবেন।"

ম্যানেজার মিথ্যে বলে নি। শ্রীর সুস্থ হতে দেরি হলে, পূর্ণিমা তাকে নিয়ে কলকাতায় চলে যাবে। কিন্তু তাহলে তো অন্তত একখানি চিঠি আসা উচিত ছিল। তাছাড়া শ্রীই বা সুস্থ হয়ে উঠবে না কেন? বড় ডাক্তার চিকিৎসা করছিলেন। পূর্ণিমা ও শঙ্করী রয়েছে। রয়েছে অহীন, বিমলবাবু ও সরোজবাবু।

না, না! শ্রী নিশ্চয়ই অনেক আগেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছে। আর কৃষ্ণ করুণা করলে তারা দু'এক দিন আগেও আমেদাবাদে চলে আসতে পারে।

তাই যেন হয়। হে বিপদভঞ্জন রাধামাধব! আমরা যেন ওদের নিয়ে একসঙ্গে কলকাতায় ফিরতে পারি।

কিন্তু আমি তো ওদের সঙ্গী হতে পারব না। আমেদাবাদে গিয়ে মানসীর চিঠি পেলে আমাকে হয়তো তীর্থযাত্রায় যতি টানতে হবে। ডাকোর না গিয়ে বৃন্দাবনের পথে রওনা হতে হবে।

তাই ভাল। আমি আজ আমেদাবাদ পৌঁছে নেমে পড়ব কুণ্ডু স্পেশালের গাড়ি থেকে। একটা দিন থেকে যাব সেখানে। কাল বিকেলে ওরা এলে ওদের বম্বে রওনা করে দেব। তারপরে আমি রওনা হব বৃন্দাবনের পথে — আমার মানসীর কাছে।

"নাতি! ও নাতি! একবার এট্টু নিচে আও না দাদা!"

তাড়াতাড়ি জানলার কাছে এসে গলা বাড়াই। মেজঠাকুরমা রেল লাইনে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছেন। বলি, "কি হয়েছে?"

"একবার এট্টু নিচে আও না।"

বিনা বাক্যব্যয়ে নেমে আসি গাড়ি থেকে। কাঁদো কাঁদো স্বরে ঠাকুরমা বলেন, "বড়ই বিপদে পড়ছি দাদা! তুমি ছাড়া কে আমাগো এই বিপদ থিকা উদ্ধার করবে?"

"কিন্তু বিপদটা কি?"

"বড় বিপদ দাদা! ঐ দেখো।"

তাকিয়ে দেখি, প্লাটফর্মের ওপরে আমাদের যেখানে রান্না হচ্ছে, তার কাছেই রয়েছে ছোট একটি বাগান। ফুল-টুল তেমন নেই, তবে জায়গাটা গলা-সমান লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা। একটি দরজা আছে কিন্তু সেটি এখন তালাবন্ধ। আর সেই বাগানেই বন্দী হয়েছেন ছোট-ঠাকুরমা।

"তা উনি ওখানে গেলেন কেমন করে আর কেনই বা গেলেন?"

"গ্যাছে ভিজা কাপড় শুকাইতে দিতে। ঢোকছে বেড়া ডিঙ্গাইয়া। কিন্তু এখন আর বাইর হইতে পারতে আছি না।"

তাড়াতাড়ি সেই বাগানের কাছে আসি, দরজাটার দিকে নজর দিতেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়। লোহার পাতের দরজা। বাইরের দিকে কতগুলো লোহার 'অ্যাংগ্‌ল' অর্থাৎ বাতা লাগানো আছে, কিন্তু ভেতরের দিকটায় মসৃণ লোহার পাত। যাবার সময় সেই বাতার

ওপরে পা দিয়ে দরজা পেরিয়েছেন ঠাকুরমা কিন্তু বের হবার সময় ওপাশটা মসৃণ বলে দরজার ওপরে উঠতে পারছেন না। দরজাটা পাঁচ ফুটের মতো উঁচু।

আমাকে দেখতে পেয়েই ছোট-ঠাকুরমা ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "দাদাগো, আমারে বাঁচাও। আমার অবস্থা যে এখন ঠিক অভিমন্যুর মতো — ঢোকতে পারছি, বাইর হইতে পারতেছি না।"

হাসি পেলেও গম্ভীর থাকতে হয়। গম্ভীর স্বরেই সান্ত্বনা দিই, "আপনি বন্দী হয়েছেন, কিন্তু আপনাকে তো সপ্তরথী বেষ্টন করেন নি। কাজেই এত ভয় পাচ্ছেন কেন? ঘাবড়াবেন না। আমি ভেতরে আসছি।"

বাগানে ভেতরে ঢুকে কোলে করে ঠাকুরমাকে বসিয়ে দিই দরজার ওপরে। বাণেশ্বর ও মতির হাত ধরে তিনি অনায়াসে নেমে আসেন নিচে। তারপরে আমি বেরিয়ে আসি বাগান থেকে। সমবেত স্বরে ঠাকুরমারা আশীর্বাদ করেন, "সোমনাথ তোমার মঙ্গল করুন দাদা!"

সরকারদা সহসা বলে ওঠেন, "মহিমাই জগতে দুর্লভ।"

আর আমি? আমি মনে মনে সোমনাথকে বলি — ঠাকুর তোমার যদি আমার মঙ্গল করার একান্তই ইচ্ছে হয়ে থাকে, তাহলে আমেদাবাদে আমাকে মানসীর একখানি চিঠি দিও আর সেখানে পৌঁছে আমাদের যেন দেখা হয় শ্রী, পূর্ণিমা ও শঙ্করীর সঙ্গে।

ঢোলা জংশন থেকে ঠিক সময়েই ট্রেণ ছাড়ল — এখন বেলা ঠিক এগারোটা। ভালই হল সন্ধের আগেই আমেদাবাদে পৌঁছে যাবো।

তবে তার যে এখনও অনেক দেরি। সারাটা দিন পড়ে আছে। যাঁরা তাশ খেলছেন কিংবা বই পড়ছেন, তাঁদের কথা আলাদা। তাঁরা টেরই পাবেন না কিভাবে ট্রেণ আমেদাবাদে পৌঁছল। কিন্তু আমরা এখন কি করি?

কৃষ্ণকথার আসর শেষ হয়েছে। সরকারদা যে অন্য কোন প্রসঙ্গে কিছু বলবেন, তারও উপায় নেই। বৌদির শরীরটা ভাল নেই

আজ। খাবার পরেই সবাই এসে ভিড় করেছেন আমাদের খোঁপে।

শেষ পর্যন্ত দাদাকেই আজকের আড্ডার 'কনৃভীনর' হতে হল। দাদা তাঁর স্কুল জীবনের গল্প বলতে শুরু করে দিলেন।

দাদার স্কুল জীবন কেটেছে পূর্ববঙ্গের এক মফস্বল শহরে। তাঁদের স্কুলের পেছনেই ছিল নদী। বর্ষাকালে নদীর জল প্রায় স্কুলদালানের গা ছুঁয়ে বয়ে যেত।

বুড়ো পণ্ডিতমশাই বড়ই ফাঁকি দিতেন। প্রায় প্রতিদিনই তিনি ক্লাশে এসে চটি জোড়া খুলে রেখে চেয়ারে পা তুলে ঘুমোতে থাকতেন। ঘন্টা পড়া পর্যন্ত চলত তাঁর দিবানিদ্রা।

ক্লাশের সবচেয়ে দুষ্টু ছেলে ছিল রমেন। একদিন সে বলে বসল —তোরা যদি আমার নাম না বলে দিস, তাহলে আমি পণ্ডিত-মশাইয়ের ঘুম বন্ধ করে দিতে পারি।

ছেলেরা সবাই একযোগে তাকে প্রতিশ্রুতি দিল।

পরদিন পণ্ডিতমশাই ক্লাসে এসে যথারীতি চটি খুলে রেখে নিদ্রাভিভূত হলেন। আর তারপরেই রমেন ঠোঁটের ওপরে আঙ্গুল তুলে সবাইকে চুপ করতে বলল। পা টিপে টিপে সে এগিয়ে গেল পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে। তাঁর সখের বিদ্যাসাগরী চটি জোড়া তুলে নিল দু'হাতে। পাশের জানলা দিয়ে ফেলে দিল নদীর জলে। সহাস্য বদনে এসে বসল নিজের জায়গায়। কিন্তু তার সহপাঠীরা শঙ্কিত বক্ষে বিস্ফোরণের প্রতীক্ষা করতে থাকল।

সেদিন কেন যেন ঘণ্টা পড়ার আগেই ঘুম ভেঙ্গে গেল পণ্ডিত-মশায়ের। তিনি পা-দুখানি নিচে নামিয়ে চটি পরতে চাইলেন। পায়ে জুতোর স্পর্শ না পেয়ে নিচের দিকে তাকালেন। সবিস্ময়ে দেখলেন, তাঁর সাধের চটি অদৃশ্য হয়েছে। বলে উঠলেন —আমার চটি, চটি কোথায় গেল?

কিন্তু কে তাঁর এ প্রশ্নের উত্তর দেবে। নেতা রমেনের নির্দেশ মতো ছেলেরা সবাই শব্দহীন।

পণ্ডিতমশাই ছেলেদের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ দু'টি দিয়ে

তখন আগুন বেরুচ্ছে। তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন — আমার চটি কে সরিয়েছো ?

শান্ত ও সুবোধ বালকের মতো রমেন উঠে দাঁড়ায়। বলে — তাই তো, ভারী মজার ব্যাপার। আপনার চটি কোথায় গেল ? একবার থামল সে। তারপরে আবার বলল — চটি এখান থেকে কোথায় যাবে ? আপনি বোধহয় এ-ক্লাশে চটি আনেন নি স্যার, আগের ক্লাশে ফেলে এসেছেন।

— না, না। চটি আনব না কেন ? চটি এনেছি। আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে। এখানে রেখেছি। তোরাই কেউ আমার চটি সরিয়েছিস।

— না স্যার ! আমরা সরাবো কেন ? আপনিই আগের ক্লাশে ফেলে এসেছেন।

খোঁজা হল সে ক্লাশ-রুম, খোঁজা হল টিচার্স-রুম কিন্তু পাওয়া গেল না চটি।

এলেন হেডমাষ্টারমশাই। তিনি ছেলেদের চটি বের করে দিতে বললেন। বলা বাহুল্য কোন ফল হল না। অবশেষে তিনি ঘোষণা করলেন — আজ ছুটির পরে তোরা কেউ বাড়ি যেতে পারবি না। আমি তোদের সন্ধে পর্যন্ত 'ডিটেইন' করলাম।

পণ্ডিতমশাইকে নিয়ে হেডমাষ্টারমশায় ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গেলেন। ছেলেরা উল্লাসে ফেটে পড়ল — জয়ের উল্লাস। চটির মায়ায় পণ্ডিত-মশাই আর কখনও ক্লাশে ঘুমাবেন না।

কিন্তু সে বিজয়োল্লাস দীর্ঘস্থায়ী হল না। কিছুক্ষণ বাদেই তাদের ক্ষিদে পেয়ে গেল। তারা নেতা রমেনকে বলল — একটা কিছু উপায় কর ভাই ! বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

রমেন কি যেন একটু ভাবল। তারপরে বলল — তোরা চুপচাপ বসে থাক, আমি খাবার নিয়ে আসছি।

স্কুল কম্পাউণ্ডের ভেতরেই হেডমাষ্টারমশায়ের কোয়ার্টার। রমেন সোজা এসে হাজির হল সেখানে। মাষ্টারমশাই তখনও স্কুল

থেকে বাড়ি ফেরেন নি। তাঁর নিঃসন্তান স্ত্রী তখন সাংসারিক কাজকর্মে ব্যস্ত। সহসা তাঁর কানে এলো—মা। মা বাড়ি আছেন? মা……।

কোমল কিশোর কণ্ঠের মাতৃ সম্বোধন সন্তানহীনা রমণীর মনকে বাৎসল্যের স্নেহরসে সিঞ্চিত করে তুলল। তিনি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলেন—কে?

—আমি আপনার ছেলে মা, আপনার স্কুলের ছাত্র।

—তা মাষ্টারমশায় তো এখন বাড়ি নেই বাবা!

—আমি আপনার কাছেই এসেছি মা!

—কেন বাবা?

জুতো চুরি ছাড়া রমেন সমস্ত ঘটনা খুলে বলল তাঁকে।

—বেশ। আমি এখুনি ওনাকে খবর পাঠাচ্ছি তোমাদের ছেড়ে দেবার জন্য। মাষ্টারমশায়ের স্ত্রী বললেন।

—ইচ্ছে করলে তা আপনি পাঠাতে পারেন মা! রমেন বলল—তবে আমি এখন আপনার কাছে এসেছি অন্য কারণে।

—কি কারণ বাবা?

—আমাদের বড্ড খিদে পেয়েছে মা! আপনি এক টিন মুড়ি, কিছু বাতাসা আর গোটা দুয়েক নারকেল দিন। আমরা খাবো।

স্নেহশীলা রমণী রমেনের আবেদন মঞ্জুর করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি মুড়ি, বাতাসা ও নারকেলের সঙ্গে কিছু কলাও পাঠিয়ে দিলেন চাকরকে দিয়ে। বিজয় গৌরবে রমেন ফিরে এলো সহপাঠীদের কাছে। সমবেত উল্লাসে ক্লাশ-রুম মুখরিত হতে থাকল।

হেডমাষ্টারমশাই বিস্মিত হলেন। 'ডিটেইন' করে রাখার পরেও ছেলেগুলো হুল্লোড় করছে। তিনি বেত হাতে নিয়ে আবার এলেন সেই ক্লাশে।

এসে তো চক্ষু স্থির। তাঁর বাড়ির চাকর ছেলেদের খাবার পরিবেশন করছে। তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে রমেন সবিনয়ে বলে—স্যার, মা আমাদের খাবার পাঠিয়েছেন।

—মা! কোন মা?

—আমাদের মা, বাবু! মাষ্টারমশায়ের চাকর জবাব দেয়। বলে—বাবু! মা বলে দিয়েছেন, খাওয়া হয়ে গেলে এই ছেলেদের যেন ছেড়ে দেওয়া হয়।

মাষ্টারমশাই নিঃশব্দে বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

রমেন সহাস্যে বলে ওঠে—'মৌনং সম্মতি লক্ষণং'।

ছেলেদের অট্টহাসিতে আবার চারদিক মুখরিত হয়।

আমরাও অট্টহাস্যে ফেটে পড়ি।

দাদার গল্প শেষ হয়। কিন্তু তিনি থামতেই বিউটি বলে ওঠে, "আরেকটা গল্প বলুন না দাদু!"

"আরেকটা?" দাদা জিজ্ঞেস করেন।

"হ্যাঁ।" বিউটি মাথা নাড়ায়। তার বেণী দুলে ওঠে।

"বেশ শোনো।" দাদা বলেন, "তবে এটাও রমেনেরই গল্প।"

"বেশ, বলুন।"

"গল্প হলেও সত্যি। ঘটনাটা ঘটেছে তার পরে।"

"কি ঘটেছে, তাই বলে ফেলুন না।" বিউটি ধৈর্যহীনা।

দাদা বলতে থাকেন—পর পর কয়েকদিন ভূগোল পড়া না পারায় ভূগোলের মাষ্টারমশাই রমেনের পাঁচ টাকা ফাইন করলেন। কাল দেব, পরশু নিয়ে আসব বলে রমেন মাস দুয়েক কাটিয়ে দিল। অবশেষে একদিন ক্ষেপে গিয়ে মাষ্টারমশায় বললেন—আজ টিফিনের পরে তুই যদি ফাইন না দিস, তাহলে আমি তোর নাম কেটে দেব।

—ঠিক আছে স্যার। আমি বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসছি।

রমেন সুবোধ বালকের মতো বেরিয়ে গেল স্কুল থেকে। তবে সে তার নিজের বাড়িতে গেল না, গেল ভূগোলের মাষ্টারমশায়ের বাড়িতে।

তেমনি মা! মা! বলে ডাক দিতেই মাষ্টারমশায়ের স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। রমেন তাঁকে প্রণাম করে বলল—মা! স্যার আমাকে পাঠিয়েছেন, পাঁচটা টাকা দিতে বলেছেন আপনাকে।

— পাঁচ টাকা! কেন?

— আজ্ঞে উনি একটা পাঁঠা কিনেছেন।

— পাঁচ টাকায় পাঁঠা!

— আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব বড় পাঁঠা, প্রায় খাসির সমান। টাকাটা দিন। স্যার আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে বলেছেন।

— কিন্তু বাড়িতে এসেছো, একটু কিছু মুখে না দিয়েই চলে যাবে বাবা!

— বেশ তো, চারটি মোয়া দিন।

মাষ্টারমশায়ের স্ত্রী যত্ন করে রমেনকে খাইয়ে তার হাতে পাঁচ টাকার একখানি নোট দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন — তা পাঁঠা কখন নিয়ে আসবে বাবা?

— পাঁঠা? আমি নয়, মাষ্টারমশায়। তিনি পাঁঠা নিয়ে আসবেন।

স্কুলে ফিরে এসেই রমেন মাষ্টারমশায়ের হাতে সেই পাঁচ টাকার নোটখানি দিয়ে বলল — এই যে স্যার, আপনার ফাইন।

দুষ্টু ছেলেটাকে জব্দ করতে পেরেছেন ভেবে মাষ্টারমশাই খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। তিনি টাকাটা স্কুলফাণ্ডে জমা করে দিলেন।

যথাসময়ে মাষ্টারমশাই বাড়ি ফিরলেন। দূর থেকে দেখতে পেলেন, তাঁর স্ত্রী দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে তাঁরই প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে রয়েছে। তিনি বিস্মিত হলেন। বিয়ের পরে স্ত্রী তাঁর জন্য ঠিক এমনি দাঁড়িয়ে থাকত। কিন্তু ছেলেপুলে হবার পরে তো সে প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে বহুকাল।

তাহলে বোধহয় কোন সুখবর আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে সে অমন করে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? মাষ্টারমশাই তাড়াতাড়ি পা চালালেন।

আর তাঁর স্ত্রী? তিনি ভাবছেন — মানুষটা খালি হাতে আসছে কেন? পাঁঠাটা কোথায় গেল?

মাষ্টারমশাই কাছে আসতেই স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন — হ্যাঁ গা,

পাঁঠাটা কোথায় ?

—পাঁঠা ! মাষ্টারমশাই আকাশ থেকে পড়েন। —পাঁঠা, কোন পাঁঠা ?

—ঐ যে ছেলেটা এসে বলল—তুমি একটা পাঁঠা কিনেছো।

—পাঁঠা কিনেছি ! কেন ?

—তা তো জানি না। ছেলেটা এসে তো তাই বলে আমার কাছে থেকে পাঁচটা টাকা চেয়ে নিয়ে গেলো।

স্ত্রী স্বামীকে খুলে বললেন সব কথা।

মাষ্টারমশাই বুঝতে পারলেন, তিনি নিজেই নিজের ফ[illegible]য়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি রমেনের বুদ্ধির তারিফ না করে পারলেন না। হাসতে হাসতে স্ত্রীকে বললেন—আমরা দুজনেই দুটি আস্ত পাঁঠা। দুষ্টু ছেলেটা তাই জানিয়ে দিয়ে গেছে আজ।

॥ বারো ॥

গল্প-গুজবে সময়টা কেটে যাচ্ছে বটে, কিন্তু ট্রেন বড্ড আস্তে চলেছে। কেবলই দাঁড়িয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যেই আমরা নির্দিষ্ট সময় থেকে ঘণ্টাদুয়েক পেছিয়ে পড়েছি। আর লেট না হলেও রাত দুটোর আগে আমেদাবাদ পৌছতে পারছি না।

খাওয়া-দাওয়া করছি, হাসি-ঠাট্টা করছি, গল্প-গুজব করছি কিন্তু কখনওই ওদের কথা ভুলতে পারছি না—শ্রী ও মানসীর কথা।

কেন যে মানসীর একখানিও চিঠি পেলাম না, বুঝে উঠতে পারছি না। খুকুর বিয়ে ভেঙে গেলেও তো সেকথা তার আমাকে একবার জানানো উচিত ছিল। তাছাড়া এতে তার এমন অখণ্ড নীরবতা পালন করারই বা কি থাকতে পারে। খুকুকে সে মেয়ের মতো মানুষ করেছে। খুকু দেখতে সুশ্রী, স্কুল ফাইন্যাল পাশ। তার বিয়েতে মানসী টাকা-পয়সাও খরচ করবে। এ সম্বন্ধ ভেঙে

গেলে কি আর পাত্র জুটবে না ?

কিন্তু আমি এখন কি করি ? যদি বৃন্দাবনে যেতে হয়, তাহলে আমেদাবাদ থেকেই যাওয়া ভাল। হাতে আর কয়েকঘণ্টা সময় আছে। এরই মধ্যে আমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

তাছাড়া শ্রীরা না পৌঁছনো পর্যন্ত আমার পক্ষে আমেদাবাদ ছেড়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। তাদের জন্যই আমাকে আজ আমেদাবাদে থেকে যেতে হবে।

সহযাত্রীদের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভাবলে অবশ্য মনটা ভারী হয়ে উঠছে। হাওড়ায় গাড়িতে ওঠার আগে আমি এঁদের কাউকেই চিনতাম না। কিন্তু আজ এঁরা সবাই আমার আপনজন। গত তিন সপ্তাহের ওপর যাত্রাপথের সমস্ত সুখ-দুঃখ আনন্দ ও বেদনা, এঁদের সঙ্গে সমান ভাবে ভাগ করে নিয়েছি। আজ এঁদের সবাইকে বিদায় দিয়ে আমাকে একা আমেদাবাদে থেকে যেতে হবে।

কিন্তু আমি যে নিরুপায়। আর এতে এত বিষণ্ণ বোধ করারই বা কি আছে ? পথের পরিচয়কে যে পথেই শেষ করে দিতে হয়। পথ চলতে গিয়ে জীবনে তো এমন কতজনের সঙ্গে পরিচয় হল। কিন্তু কেবল মানসী ছাড়া আর সবাই যে হারিয়ে গেল বিস্মৃতির অতল গহ্বরে।

বিদায় যখন একদিন নিতেই হবে, তখন আজ নিতে আপত্তি কেন ? বরং আজ যদি আমেদাবাদে থেকে যাই, তাহলে শ্রী, পূর্ণিমা ও শঙ্করীর খুবই উপকার হবে। কাল রাতে কিংবা পরশু সকালে ওঁদের বম্বের ট্রেনে তুলে দিয়ে আমিও নিশ্চিন্ত মনে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করতে পারি।

তাছাড়া আমেদাবাদে আমার কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন আছেন। কাল সারাদিন তাদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়াবো। সময়টা ভালই কাটবে।

তবে কথাটা এখন গোপন রাখাই উচিত হবে। মা দাদা দিদি উমাদি কল্পনাদি সরকারদা সত্যেনদা ঠাকুরমারা ম্যানেজার বিউটি

অমিয়বাবু সাহাবাবু ও সামন্তবাবুসহ সবাই আপত্তি করবেন। আমি যে এখন এঁদের সবার আত্মীয় — পরমাত্মীয়। স্বজন বিরহ সর্বদাই বেদনাদায়ক। কাজেই একেবারে শেষ সময়ে কথাটা বলতে হবে তাঁদের।

তাসের আড্ডা শেষ হল। সামন্তবাবু চলে যাচ্ছিলেন নিজের জায়গায়। আমি ডাকতেই তিনি কাছে আসেন। বলি, "বসুন।"

ভদ্রলোক উদার এবং ভক্ত। বয়স পাঁচের ঘরে। কালো ও রোগা সাধারণ বাঙালী চেহারা। খুব কম কথা বলেন। বড়বাজারে মসলার আড়ত আছে। দেখে মনে হয় বেশ স্বচ্ছল অবস্থা। স্ত্রী, দুটি ছেলে ও একজন কর্মচারী নিয়ে তীর্থে বেরিয়েছেন। প্রতি বড় মন্দিরেই কিছু না কিছু দান করেছেন।

ক'দিন ধরেই সামন্তবাবুকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছি। কিন্তু সুযোগ হয়ে ওঠে নি। আজ পাশে বসতেই জিজ্ঞেস করে ফেলি, "আচ্ছা, আপনি বোধহয় ছোটবেলা থেকেই মসলার ব্যবসায় আছেন?"

"হ্যাঁ।" সামন্তবাবু ঘাড় নাড়েন। "এ আমাদের তিন পুরুষের ব্যবসা।"

"আমাকে সংক্ষেপে একটু মসলা ও মসলার ইতিহাস সম্পর্কে কিছু বলুন না।"

সামন্তবাবু আপত্তি করেন। বলেন, "কি হবে মসলার কথা শুনে?"

"আমার অনেকদিনের কৌতূহল।"

"বেশ, শুনুন তাহলে।" সামন্তবাবু বলতে থাকেন, "মসলা শব্দটি আরবী 'মসালা' শব্দের অপভ্রংশ। আর ইংরেজী 'Spice' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'Species' শব্দ থেকে। গ্রীকরা মসলাকে বলেন 'Aroma' এবং ফরাসীরা বলেন 'Epice'.

"মসলা মূলতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলের উদ্ভিদ। প্রাচীনকালে কেবল কয়েকটি বীজ, শেকড়, ফল ও পাতাকেই মসলা বলা হত। এখন প্রায় পঞ্চাশ রকমের গাছ থেকে মসলা তৈরি হয়। সভ্যতার

অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মসলাও তার অগ্রগতি অব্যাহত রেখে চলেছে।

"মসলার ইতিহাস বলতে হলে মনুষ্য-সভ্যতার আদিপর্বের শরণ নিতে হবে। সভ্যতার সেই প্রথম যুগ থেকেই খাদ্যদ্রব্যকে রক্ষা করা ও সুস্বাদু করে তুলবার জন্য মসলার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। তবে সেকালে দেবতার চরণে নৈবেদ্য দেবার জন্যই বেশির ভাগ মসলা ব্যবহৃত হত।

"আগুন আবিষ্কারের দিন থেকেই মনুষ্য-সভ্যতার সূত্রপাত। কিন্তু তার আগেও এ পৃথিবীতে মানুষ ছিল। তারা রান্না করতে জানত না। বনের ফল-মূল, লতা-পাতা এবং পশু-পক্ষীর কাঁচা মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করত। তাদেরও আস্বাদনক্ষমতা এবং ঘ্রাণশক্তি ছিল। ফলে আগুন আবিষ্কারের আগেই মানুষ মসলা আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিল। তারা মসলার গুণাগুণ বুঝতে পেরেছিল। তাই তারা এই প্রিয় বস্তুকে দেবতার চরণে নৈবেদ্য দিত।

"ঠিক কবে থেকে মানুষ মসলার ব্যবহার শুরু করেছে, তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে তাইগ্রিস নদীর উভয় তীরে যখন আসিরিয় সভ্যতা বিকাশলাভ করে, তখনও মানুষ মসলার ব্যবহার জানত। কারণ আসিরিয় দেবতারা নাকি মসলা দেওয়া মদ খেতেন। তার মানে পাঁচ হাজার বছর আগেও মানুষ মসলার ব্যবহার জানত।

বাইবেলেও মসলার উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে, যোশেফের বাবা জ্যাকভ তাঁকে একটু বেশি ভালবাসতেন বলে তাঁর অন্যান্য ভাইরা ক্ষেপে গেলেন। তাঁরা যোশেফকে একজন বিদেশী মসলা ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দিলেন। ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন, যোশেফের এই ঘটনাটি ঘটেছিল খ্রীষ্টপূর্ব ১৭২৯ অব্দে। অর্থাৎ ৩৭০০ বছর আগেও পৃথিবীতে মসলার ব্যবসা চলত।

"দক্ষিণ আরবের বণিকরাই বোধকরি প্রথম এই ব্যবসা শুরু করেন। তাঁরা যেমন স্বদেশে মসলার চাষ করতেন, তেমনি বিদেশ থেকেও মসলা আমদানী করতেন। এই ব্যবসায় নিজেদের একচেটিয়া

আধিপত্য বজায় রাখবার জন্য তাঁরা সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। তাই ভাল মসলার উৎপাদনক্ষেত্রগুলির কথা তাঁরা গোপন রাখতেন। অনুমান করা হয় যে ভারতবর্ষ ছিল তাঁদের শ্রেষ্ঠ উৎপাদনক্ষেত্রগুলির অন্যতম। মধ্য-এশিয়া এবং য়ুরোপ ছিল তাঁদের প্রধান বাজার। 'Herodotus', 'Theophrastus', 'Strabo' এবং 'Pliny' প্রভৃতির বিবরণ থেকে আমরা দক্ষিণ আরবের মসলা ব্যবসায়ীদের বিষয়ে অনেক কথা জানতে পারি।..."

"হেরোদোতাস তো জন্মেছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে।" আমি সবিস্ময়ে বলে উঠি।

"হ্যাঁ।" মাথা নাড়েন সামন্তবাবু। বলেন, "তার একশ' বছর পরে থিওফ্রাসতাস এবং চারশ' বছর পরে স্ট্র্যাবো। আর প্লিনী দি এলডার জন্মেছিলেন ২৩ খ্রীষ্টাব্দে। ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মাউণ্ট বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে যখন পম্পেই নগরী ধ্বংস হয়, তখন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

"সে যাই হোক্, তাদের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি, সেকালে য়ুরোপের সমাজ-জীবনে বিশেষ করে গ্রীক ও রোমানদের জীবনে মসলার খুবই প্রভাব ছিল। যুদ্ধ কিংবা শান্তি — সর্বদাই মসলার কদর ছিল। প্রাসাদ কিংবা মন্দির — সর্বত্র মসলা সমান সমাদৃত হত। তাই দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার ভারত থেকে দেশে ফেরার সময় প্রচুর মসলা সঙ্গে নিয়েছিলেন।

"সেকালে সমস্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই মসলার চাষ হত। কিন্তু ভারতের মসলা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। মসলার ব্যবসা আরব বণিকদের করতলগত হবার অন্যতম কারণ, তাঁরা ভারতের জলপথ জানতেন। তাঁরা যে ভারত থেকে মসলা নিয়ে য়ুরোপের বাজার দখল করেছেন, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে এ সংবাদটি প্রকাশ হয়ে যায়। ফলে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের মাঝে ভারতের জলপথ আবিষ্কারের প্রতিযোগীতা শুরু হয়ে যায়।

"মসলার দেশ ভারতে পৌঁছবার জন্য আটলান্টিকে অসংখ্য

জাহাজ ভাসল। ক্রিস্টোফার কলম্বাস, জন ক্যাবোট, ভাসকো-ডা-গামা, স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক্ প্রভৃতি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত নাবিকরা নিজ নিজ দেশের প্রয়োজনীয় মসলা সংগ্রহের জন্যই ভারতের জলপথ আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন।

"১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে পর্তুগীজ নাবিক ভাসকো-ডা-গামা ভারতের জলপথ আবিষ্কার করলেন। অশান্ত আটলান্টিক ও বিপদ-শঙ্কুল উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে তিনি কালিকট বন্দরে পৌছলেন। মসলার জন্যই সেদিন য়ুরোপ ভারত আবিষ্কার করেছিল। তারপরেই মসলা ব্যবসা আরবী বণিকদের হাতছাড়া হয়ে যায়। আর পর্তুগীজ নাবিকরা তাঁদের জায়গা দখল করেন।

"দুর্ভাগ্যের কথা, যে ভারতীয় মসলার জন্য সেকালে দেশে দেশে ঝড় বয়ে গেছে, সেই ভারত আজ মসলার ব্যবসায় ক্রমেই পেছিয়ে পড়ছে। নিজেদের অযোগ্যতাই এই ব্যর্থতার কারণ। কিন্তু আজ সময় এসেছে বিগতযুগের ব্যর্থতার হিসেব-নিকেশ করে সাফল্যের সিংহদ্বারে এগিয়ে যাবার।..."

"খিড়কী বন্ধ্ কিজীয়ে, শাট্-আপ দা উইন্‌ডোজ প্লীজ!"

থামতে হয় সামন্তবাবুকে। তাকিয়ে দেখি একটা স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। কালো কোট পরা জনৈক রেলকর্মচারী গাড়ির জানলা বন্ধ করে দিতে বলছেন। কিন্তু কেন?

ভদ্রলোক বলেন — আজ এখানে সাধাবণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। রেল চলেছে বলে কোথাও কোথাও দুষ্কৃতকারীরা পাথর ছুড়ে মারছে। দুপুরে এই স্টেশনে গোলমাল হয়েছে। আমেদাবাদে কাল সূর্যোদয় পর্যন্ত সান্ধ্য আইন জারী করা হয়েছে।

আমরা যে সেই আমেদাবাদেই যাচ্ছি। যেতে পারব কি? অত্যন্ত মন্থর গতিতে গাড়ি চলেছে। ক্রমেই 'লেট' বাড়ছে।

ওদেরই বা কি হবে — শ্রী, পূর্ণিমা ও শঙ্করীর। ওদেরও তো আবু-রোড থেকে আমেদাবাদে আসতে হবে। পারবে কি? কে জানে সোমনাথজীর মনে কি আছে?

যথাসময়ে বৈকালীন চা ও জলখাবার এলো। বন্ধ গাড়ির ভেতরে বসে আমরা সেগুলির সদ্ব্যবহার করছি। গাড়ির বাইরে বোধহয় সূর্যাস্তের রঙ লেগেছে। বসুন্ধরা হয়ে উঠেছে মোহময়ী। কিন্তু সে দৃশ্য দেখবার সুযোগ নেই। জানলা খোলা যাবে না — কারা নাকি পাথর ছুড়তে পারে।

ঠাকুরমারা কিন্তু মাঝে মাঝেই সে আদেশ অমান্য করছেন। তাঁরা জানলা ফাঁক করে বাইরের দৃশ্য দেখছেন। কিন্তু রেললাইনের ধারে লোকজন দেখতে পেলেই তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে দিচ্ছেন। বলা বাহুল্য এখন পর্যন্ত আমাদের গাড়িতে কোন ঢিল পড়ে নি।

গাড়ির ভেতর আঁধার ঘনিয়ে এসেছিল অনেকক্ষণ, এখন নিশ্চয়ই বাইরের জগতেও আঁধার নেমেছে। সে আঁধার শুধু আলোর স্বল্পতা নয়। সেই সঙ্গে অবিশ্বাস আর হিংসার আঁধার, দুর্নীতি আর উচ্ছৃঙ্খলতার আঁধার, লোভ মোহ কাম আর ক্রোধের আঁধার। লাভ-অলাভ, কার্য-কারণ, ন্যায় ও নীতির কথা চিন্তা না করে মানুষ মানুষকে মারছে। এ যেন মহাভারতের সেই মৌষলপর্ব। ভগবান নিজেই ভ্রাতৃহত্যার সামিল হয়েছেন।

"মা দিদিমা মাসিমা পিসীমা জ্যাঠা ও কাকারা! একটু বাদেই গাড়ি সবরমতী পুলের ওপরে উঠবে। পুল পেরিয়েই আমেদাবাদ।"

ম্যানেজারের কথায় আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। ম্যানেজার বলে চলেছে, "হাওড়া থেকে, আমরা যে ব্রডগেজ স্পেশাল ট্যুরিস্ট কোচ্-এ রওনা হয়েছিলাম, সেই কোচ্‌টি আগ্রাফোর্ট থেকে সোজা আমেদাবাদে চলে এসেছে। কাজেই এখানে আমরা এই মিটার-গেজের গাড়ি ছেড়ে দিয়ে সেই ব্রডগেজ গাড়ির সওয়ার হব। আপনারা জিনিসপত্র গোজগাছ করে নিজেদের বার্থের ওপরে রেখে দিন, আমরা সব নতুন গাড়িতে তুলে দেব। আরেকটা কথা……"

ম্যানেজার একবার থামে। তারপরে গলার স্বর আরও কোমল করে বলে, "একটা রাত একটু কষ্ট করতে হবে আপনাদের …"

শেষ করে না ম্যানেজার। আমরা তার মুখের দিকে তাকাই। সে

আবার বলে, "আজ রাতে আমি আপনাদের ভাত খাওয়াতে পারব না। আমেদাবাদে কার্ফু চলেছে। কাজেই স্টেশনের বাইরে গিয়ে বাজার করা সম্ভব নয়। আজ তাই লুচি বেগুনভাজা ও মিষ্টি খাওয়াবো।"

"মিষ্টি কোথায় পাবে ম্যানেজার, আমেদাবাদে যে কার্ফু চলেছে?" দাদা প্রশ্ন করেন।

ম্যানেজার উত্তর দেয়, আজ্ঞে। ঢোলা থেকে নিয়ে এসেছি।"

"সাবাস ম্যানেজার, সাবাস!"

নির্দিষ্ট সময়ের তিনঘণ্টা পরে, তার মানে রাত ন'টার সময় আমরা আমেদাবাদ পৌছলাম। প্লাটফর্মে পা রাখতেই আমার বুকটা কেঁপে ওঠে। যাঁদের সঙ্গে এইমাত্র এখানে এলাম, কিছুক্ষণ পরেই তাঁদের সবাইকে আমার বিদায় জানাতে হবে। ওঁরা চলে যাবেন ডাকোরের পথে, আমি পড়ে থাকব এখানে।

কথাটা এখনও বলি নি কাউকে। বলতে হবে একটু বাদেই। কিন্তু তার আগে একবার স্টেশনমাষ্টারের অফিসে গিয়ে চিঠিপত্র দেখা দরকার, যাওয়া দরকার ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমে। দেখতে হবে মানসীর কোন চিঠি আছে কিনা আর শঙ্করীরা এসে পৌচেছে কিনা?

দুটোরই সম্ভাবনা কম। তাহলেও যেতে হবে।

মাসিমা করুণকণ্ঠে আবার বলেন, "একবার গিয়ে দেখে এসো বাবা, ওরা এসেছে কিনা?"

তাঁর ব্যাকুলতা খুবই স্বাভাবিক। নেহাৎ নিরুপায় হয়েই তিনি সেদিন দুটি যুবতী মেয়ে ও একটি অবুঝ নাতনীকে ফেলে দ্বারকার পথে পা বাড়িয়েছিলেন। এতদিন মনের আকুলতা প্রকাশ করেন নি, কিন্তু আজ আর স্থির থাকতে পারছেন না।

তাঁকে আশ্বস্ত করে সাহাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলি। কিন্তু

এগোবার কি উপায় আছে ? সারা স্টেশন লোকে লোকারণ্য। শহরে কার্ফু। কার্ফু পাশ দেওয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ আগন্তুকই রাতখানা স্টেশনে কাটাতে মনস্থ করেছেন। যে যেখানে পেরেছেন, বিছানা বিছিয়েছেন।

ভিড় ঠেলে অতিকষ্টে এগিয়ে চলি। ওভারব্রিজ পেরিয়ে স্টেশনের প্রধান অংশে আসি। সামনেই স্টেশন-মাস্টারের অফিস। তাঁর 'কেয়ার'-এ আসা যাত্রীদের চিঠিপত্রের বাস্কেট পড়ে আছে একপাশে। আমরা দুজনে চিঠি খুঁজতে শুরু করি।

পেয়ে যাই। একখানি ইনল্যাণ্ড লেটার পেয়ে যাই আমি। হ্যাঁ, মানসী! আমার মানসীর চিঠি। কি খবর কে জানে ? কম্পিত হাতে কোনমতে খুলে ফেলি চিঠিটা। মানসী লিখেছে—

বৃন্দাবন।

সখা,

রাজভূমি-রাজস্থান ও মন-দ্বারকা দর্শন করে তুমি এখন পুণ্যতীর্থ-প্রভাসের পথে যাত্রা করেছো। আমার চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছবে, তখন তোমার প্রভাস পরিক্রমাও পূর্ণ হয়েছে।

আমি তোমার চিঠি পেয়েছি। করুণাময় কৃষ্ণের কৃপায় এবারে তোমার শরীর সুস্থ আছে জেনে শান্তিতে দিন কাটাতে পারছি।

তুমি আমার চিঠি না পেয়ে বোধকরি অশান্ত হয়ে পড়েছো। হও গে। তোমাকে কষ্ট দেবার জন্যই আমি তোমাকে চিঠি দিই নি এতদিন। কেমন শাস্তি! এবারে তো বুঝতে পারলে চিঠি না পেলে মনের অবস্থাটা কি রকম হয় ? আশাকরি কথাটা চিরকাল মনে থাকবে এবং ভবিষ্যতে নিয়মিত চিঠি লিখবে।

তোমার অসুবিধে হবে ভেবে শেষ পর্যন্ত ৫ই বৈশাখ

খুকুর বিয়ের দিন ঠিক করলাম। ফাল্গুনে বিয়ে হলে যে তোমাকে ডাকোর, নাসিক ও অজন্তা-ইলোরা না দেখেই বৃন্দাবন চলে আসতে হয়। সেটা আমার কছে বড়ই দুঃখের হবে।

তার চেয়ে এই ভাল হল। সব দেখে শুনে তুমি সহযাত্রীদের সঙ্গেই কলকাতায় ফিরে যাও। ২রা রওনা হয়ে ৩রা বৈশাখ বৃন্দাবনে এসো। দেখো, আবার সংক্রান্তি কিংবা নববর্ষে রওনা হয়ো না যেন।

কিন্তু খুকুর বিয়ের পরে তোমাকে এবারে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে বৃন্দাবনে। তুমি তো জানো, খুকু চলে যাবার পরে বাড়িতে আমি একেবারেই একা হয়ে যাবো। তুমি ছাড়া আর কে আমার সেই নিঃসঙ্গ জীবনের অবসাদ ঘোচাতে পারে সখা?

সাবধানে থেকো। চিঠি লিখো। প্রণাম নিও।

তোমার মানসী

"চলুন, ঘোষদা!"

সাহাবাবুর ডাকে আমার চমক ভাঙে। নিজের স্বার্থপরতার জন্য লজ্জা পাই। মানসীর চিঠি পেয়ে আমি শ্রীর কথা একেবারে ভুলে বসে আছি। অথচ আমারই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য শ্রী অমন অসুস্থ হয়ে পড়ল। পূর্ণিমা ও শঙ্করীর দ্বারকা ও প্রভাস দর্শন হল না।

মানসীর চিঠিটা পকেটে রেখে সাহাবাবুর সঙ্গে এগিয়ে চলি। মনে মনে বলি—রণছোড়জী, সোমনাথজী! তোমাদের অশেষ করুণা। আমি মানসীর চিঠি পেয়েছি। কিন্তু তোমরা তো ইচ্ছে করলে আমার শ্রীকেও আজ দিতে পারো ফিরিয়ে। তোমরা তাকে এনে দাও প্রভু!

"এইতো ওয়েটিং রুম। এখানেই ওদের থাকার কথা।"

তাকিয়ে দেখি, সাহাবাবু ঠিকই বলেছেন। সামনেই 'ফার্স্ট'

ক্লাশ লেডিজ ওয়েটিং রুম'। ওরা যদি এসে থাকে, এখানেই অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলি। মেয়েদের বিশ্রামালয় জেনেও একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়ি। বিশ্রামরত মহিলারা সবাই বিরক্তভাবে আমাদের দিকে তাকান।

না। নেই। ওরা কেউ নেই এখানে। নেই ওদের মালপত্র। নেই শঙ্করী পূর্ণিমা ও অহীন। নেই শ্রী। সে আসে নি আমেদাবাদ। কেন আসবে? তাদের যে আগামীকাল আসতে বলা হয়েছে।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসি বাইরে। কিন্তু তারপরে দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়ি। এবারে কোথায় যাবো? কেমন করে মুখ দেখাবো মাসিমার কাছে। তিনি যে ওদের পথ চেয়ে বসে রয়েছেন। ফিরে গিয়ে কি বলব তাঁকে?

সাহাবাবুর মুখখানিও শুকিয়ে গিয়েছে। তাঁরও চোখ দুটি অশ্রু-সিক্ত। করুণকণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করেন, "কি হবে ঘোষদা! ওরা যে আসে নি এখানে।"

এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই আমার। আমি চুপ করে থাকি। চোখের সামনে ভেসে ওঠে আমার সেই সাতবছরের ভাগনীর রোগ-পাণ্ডুর মুখখানি। কানে আসে সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—মামু, তুমি দিদিমাকে নিয়ে দ্বারকা ও প্রভাসে যাও। দেখে এসো রণছোড়জী ও সোমনাথজীকে। আমি তো তাঁদের কাছে যেতে পারছি না। তুমি না গেলে, কে ফিরে এসে আমাকে তাঁদের গল্প বলবে?

ওর কথামত আমি দর্শন করে এসেছি রণছোড়জী ও সোমনাথজীকে। কিন্তু আজ কার কাছে আমি তাঁদের গল্প বলব?

"আমার স্ত্রী ও শাশুড়ীকে এখন আমি কি কৈফিয়ৎ দিই? ভগবান না করুন, ওদের যদি কোন বিপদ-আপদ ঘটে থাকে, তাহলে আমি শ্রীর বাবাকেই বা কি বলব? আমিই যে তাকে বলে শ্রীকে নিয়ে এসেছিলাম।" সাহাবাবুর স্বরে অনুতাপ।

অতিকষ্টে খানিকটা সামলে নিই নিজেকে। যথাসম্ভব স্বাভাবিক

স্বরে বলি, "আগে সে খবরটাই নেওয়া দরকার আবু-রোড থেকে — ওরা কেমন আছে, কোথায় আছে ?"

"তাহলে তো ম্যানেজারবাবুর কাছে একবার যাওয়া দরকার। তিনি যদি রেলওয়ে কণ্ট্রোলের মারফৎ খবরটা নিতে পারেন।"

"তার আগে চলুন, জেণ্ট্‌স ওয়েটিং-রুমটাও দেখে নিই।"

"কোন লাভ হবে কি ?"

"হয়তো হবে না। তাহলেও চলুন, একবার দেখা যাক্।"

"বেশ চলুন।"

লেডিজ ওয়েটিং-রুমের পাশেই 'ফার্স্টক্লাশ জেণ্ট্‌স ওয়েটিং রুম'। একই ভাবে দরজা খুলে আমরা ভেতরে ঢুকে পড়ি। আর ঠিক তখুনি —

"মামু!"

"কে ?"

"আমি। আমরা। মা, মাসি, অহীনদা! মামু এসেছে, মেসো এসেছে।"

সেই উচ্ছ্বসিত স্নিগ্ধ-মধুর স্বর। কতদিন পরে শুনছি।

এসেছে, আমার শ্রী ফিরে এসেছে।

সাহাবাবুও একই কথা বলেন, "ঘোষদা! ওরা এসে গেছে।"

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো মাথা নাড়ি।

শঙ্করী, পূর্ণিমা ও অহীন উঠে দাঁড়ায়।

শঙ্করী বলে, "ঘোষদা, বসুন। বসুন জামাইবাবু!"

"আপনারাও তাহলে আজই এসে গিয়েছেন। ভালই হল।" পূর্ণিমার স্বরে নিশ্চিন্ত হবার আনন্দ।

শঙ্করী বলে, "ভাগ্যিস বিমলদা ও সরোজদা আজই পাঠিয়ে দিলেন আমাদের। বললেন — শ্রী যখন ভাল হয়ে গিয়েছে, তোমরা একদিন আগেই আমেদাবাদে চলে যাও। বড় জায়গা, ভালই লাগবে।"

"সত্যই ঘোষদা!" অহীন যোগ করে, "বিমলবাবু ও সরোজ-

বাবুর তুলনা হয় না। কোন অচেনা মানুষ যে কারও জন্য এতখানি করতে পারে, এর আগে জানা ছিল না আমার।"

কিন্তু বিমলবাবু ও সরোজবাবুর উদারতার কথা পরে শোনা যাবে। শঙ্করী পূর্ণিমা ও অহীনের খবর নেবার সময়ও এখন নয়।

আমি এগিয়ে চলি শ্রীর কাছে। সে-ও ইতিমধ্যে সোফা থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

আমি নিচু হয়ে হাত দুটি বাড়িয়ে দিই। সে ছুটে এসে ধরা দেয় আমাকে। আমি তাকে কোলে তুলে নিই।

ছোট হাত-দুখানি দিয়ে শ্রী আমার গলা জড়িয়ে ধরে। আমার কাঁধে মাথা রাখে। আদুরে স্বরে বলে, "মামু! আমি তোমার সঙ্গে ডাকোর, বম্বে ··আর যেন কোথায় যাবো আমরা?"

মুচকি হেসে উত্তর দিই, "নাসিক, অজন্তা-ইলোরা।"

"হ্যাঁ, নাসিক, অজন্তা আর ইলোরা যাবো আমরা। যেতে যেতে দ্বারকা ও প্রভাসের গল্প শুনব। বলবে না মামু?" শ্রী মাথা তোলে। সে আমার মুখের দিকে তাকায়।

"বলব বৈকি মা! আমি তোমাকে অনেক গল্প বলব।"

"ইস! কি মজাই হবে তাহলে!" শ্রী আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে। তারপরেই সে আমার বুকে মুখ লুকোয়।

মনে মনে বলি—ঠাকুর! পুণ্যতীর্থ-প্রভাস পরিক্রমার পুণ্যফল আমি হাতে হাতে পেয়ে গেলাম। অসুস্থ শ্রীকে সুস্থ করে তুমি ফিরিয়ে দিলে আমাকে। হে মানুষের ভগবান, হে করুণাময় কৃষ্ণ! তুমি আমার সকৃতজ্ঞ চিত্তের সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করো—

'শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজং।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥···'

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

প্রভাসের প্রধান দর্শনীয় স্থান

১। **ভালকাতীর্থ**—ভেরাভল ও প্রভাস-পাটনের মধ্যপথে অবস্থিত। কথিত আছে জরা ব্যাধ এখানেই শ্রীকৃষ্ণকে বাণবিদ্ধ করেছিলেন।

২। **শশীভূষণ-মহাদেবের মন্দির**—ভেরাভল ও প্রভাসের মাঝে সাগরতীরে অবস্থিত। কথিত আছে চন্দ্র নাকি এখানেই তপস্যা করে আংশিক ক্ষয়মুক্ত হয়েছেন।

৩। **ত্রিবেণী-সঙ্গম**—হিরণ্য, কপিলা ও সরস্বতীর সঙ্গম। মিলিতধারা আরব সাগরে পড়েছে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠতীর্থ। এখানে পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধ করলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। কাছেই মহাকালিকা মন্দির।

৪। **সূর্য-নারায়ণ মন্দির**—ত্রিবেণী সঙ্গমের কাছে অবস্থিত। পাশে শ্রীসারদামঠ।

৫। **গীতা মন্দির**—ত্রিবেণী সঙ্গমের অনতিদূরে সোমনাথ ট্রাস্ট-য়ের নবনির্মিত মন্দির। মন্দিরগাত্রে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা লিখিত। শ্রীকৃষ্ণের মনোহর মূর্তি মন্দিরের মূল-বিগ্রহ। পাশে বলরামের গুহা।

৬। **দেহোৎসর্গ**—গীতা মন্দিরের কাছে অবস্থিত। কথিত আছে অর্জুন এখানেই কৃষ্ণ ও বলরামের মরদেহ সৎকার করেছিলেন! পাশেই হিরণ্যনদী।

৭। **শ্রীবল্লভাচার্যের বৈঠক**—দেহোৎসর্গের কাছে অবস্থিত। কথিত আছে শ্রীবল্লভাচার্য প্রভাস পরিক্রমার সময়ে এখানে বাস করেছেন। পাশে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির।

৮। **রুদ্রেশ্বর-মহাদেবের মন্দির**—ত্রিবেণী সঙ্গম থেকে সোমনাথ মন্দিরে যাবার পথে অবস্থিত।

৯। **দৈত্যসূদন-মহাবিষ্ণু মন্দির**—প্রভাসের প্রধান বাজারে অবস্থিত। গুপ্তযুগের (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক) মন্দির। মুসলমান আমলে বার বার বিনষ্ট হয়েছে। কিন্তু ধর্মান্ধ শাসকরা দুটি প্রাচীন বিগ্রহকে ধ্বংস করতে পারে নি। এই বিগ্রহ দুটি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের অবশ্য দর্শনীয়। বর্তমান মূল-বিগ্রহটি গত শতাব্দীতে নির্মিত।

১০। **গজেন্দ্রপূর্ণ প্রাসাদ**—সোমনাথ মন্দিরের কাছে অবস্থিত প্রভাসের প্রধান জৈনমন্দির।

১১। **রাণী অহল্যাবাঈ নির্মিত সোমনাথের মন্দির।**

১২। **সোমনাথের নতুন মন্দির।**

ছোট ও বড় মিলিয়ে প্রভাসে প্রায় শ'খানেক দর্শন আছে। ভেরাভল থেকে টাঙ্গা নিয়ে দর্শন করতে হয়। সব দেখতে হলে অন্তত একটি রাত থাকতে হয়। নিচের যেকোন আশ্রয়ে রাত্রিবাস করা যায়—

১। **রেলওয়ে রিটায়ারিং রুম**—ভেরাভল।

২। **শ্রীরামনিবাস ধর্মশালা**—ভেরাভল। রেলস্টেশনের কাছে শেঠ বনমালী বীরজী নির্মিত মনোরম বিশ্রামগৃহ। তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের রাত্রিবাসের সুবন্দোবস্ত রয়েছে।

৩। **রাজেন্দ্র ভবন**—ভেরাভল। নির্মাণ বিভাগের ধর্মশালা। ডেপুটি ইঞ্জিনীয়ার, পি. ডাবলু. ডি., ভেরাভল—এই ঠিকানায় আগে চিঠি লিখে ঘর ঠিক করতে হয়। খাবার কিনতে পাওয়া যায়।

৪। **শ্রীভাটিয়া ধর্মশালা**—প্রভাস-পাটন।

৫। **শ্রীসিংঘানিয়া ধর্মশালা**—প্রভাস-পাটন।

৬। **গোবর্ধন ভবন** (ধর্মশালা)—প্রভাস-পাটন।

৭। **বিশ্রাম ভবন**—নতুন সোমনাথ মন্দির। সোমনাথ মন্দিরের এস্টেট ম্যানেজারকে আগে চিঠি লিখলে তিনি ঘর রেখে দেন। সঙ্গে মহিলা-মণ্ডলের ক্যান্টিন রয়েছে। সেখানে সবরকম খাবার পাওয়া যায়।

যাত্রাকাল—অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী।



॥ সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ ॥

যাঁদের বই থেকে সাহায্য নিয়েছি—

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীকৃষ্ণচরিত্র
„ কালীপ্রসন্ন সিংহ (অনুবাদক)	মহাভারত
„ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য (অনুবাদক)	মহাভারতম্
„ রাজশেখর বসু (অনুবাদ)	মহাভারত
„ দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পাদক)	কাশীদাসী মহাভারত
„ নগেন্দ্রনাথ বসু	বিশ্বকোষ
„ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বৃত্রসংহার কাব্য
„ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী (অনুবাদক)	শ্রীমদ্ভাগবতম্ (দশম স্কন্ধ)
„ স্বামী দিব্যাত্মানন্দ	পুণ্যতীর্থ-ভারত
„ „ ধ্রুবানন্দ গিরি	শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা
„ বিমানবিহারী মজুমদার	চণ্ডীদাসের পদাবলী
„ সুনীলকুমার ঘোষ	রাজা গেল রাজ্য গেল
„ অনাথনাথ বসু	মীরাবাঈ
„ কল্যাণরায় জোসী	দ্বারকা-অসইনা পরাণা অবশেষো (গুজরাতী)
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (প্রকাশক)	ভারতকোষ
Shree N. L. Dey	The Geographical Dictionary of Ancient & Mediaeval India
„ B. C. Law	Holy Places of India
„ J. H. Dave	Immortal India, vols. II & IV
„ E. W. Hopkins	The Great Epic of India
„ „	Epic Mythology
„ R. C Majumdar & Ors.	Advanced History of India
„ S. H. Desai	Probhas & Somnath
„	Junagdh & Girnar
„ D. Chatterjee	Handbook of India
Somnath Trust	Guide to Somnath

V. A. Smith . Oxford History of India
Encyclopaedia Britannica , Encyclopedia Americana
Fodor's India, 1975, Imperial Gazetteers,
District Gazetteers and Census Handbooks—1971.

যাঁরা নানাভাবে সাহায্য করেছেন—

ডক্টর করুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

,, দিলীপকুমার মিত্র (জাতীয় গ্রন্থাগার)

শ্রীকে. ডি. জাসানি ,,

,, নচিকেতা ভরদ্বাজ ,,

,, সুভাষ সমাজদার ,,

,, শঙ্কর ভাদুড়ী ,,

,, রণজিৎকুমার সরকার ,,

,, শিবনাথ পাণ্ডে ,,

,, প্রমথচন্দ্র ভাওয়াল, কোকরাঝাড়

,, কানাইলাল দাস, বিরাটী

,, দিবাকর মুখোপাধ্যায়, টাকি

,, দেবাশীষ ভট্টাচার্য, সখেরবাজার

,, সুশীলকুমার ভৌমিক, তমলুক

,, ভুবনমোহন খাণ্ডা, কাঁথি

,, জগন্নাথ ভট্টাচার্য

,, অজিতকুমার জানা (রামনগর, দীঘা)

,, মনোরঞ্জন সার (রামনগর, দীঘা)

,, বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য, রহড়া

শ্রীমতী প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গারাম

,, রীতা পাল, নব ব্যারাকপুর

,, শান্তা পাল, ,,

,, কুমকুম গুহ, বেহালা

,, প্রগতি শর্মা, জোড়হাট

ও

গৌতম ঘোষ দস্তিদার, ঢাকুরিয়া
